শুভ
শারদীয়া সংখ্যা
২০২৬

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

"জাগরণে যারে দেখিতে না পাই
থাকি স্বপনের আশে,
ঘুমের আড়ালে যদি দেখা দেয়,
বাঁধিব স্বপন পাশে।
এত ভালবাসি, এত যারে চাই,
সদা মনে হয় সে যে কাছে নাই;
যেন এ আমার আকুল আবেগ,
তাহারে আনিবে ডাকি,
দিবস রজনী আমি যেন কার আসার আশায় থাকি।"

পিতৃদেব ৺রমেন ভট্টাচার্য্য ও মাতৃদেবী ঁসুমিত্রা ভট্টাচার্য্যকে স্মরণে রেখে

শ্রীশ্রীগুরুচরণাশ্রিত—
নীলাঞ্জন, সোহিনী, অঙ্কিত ও আরভ্
মুম্বাই

শ্রীশ্রীবালেশ্বরী পত্রিকা

৬৫ তম বর্ষ ● শুভ শারদীয়া তিথি ১৪৩৩ সন ● তৃতীয় সংখ্যা

সেক্রেটারী: শ্রী সুরজিৎ দে

সম্পাদিকা: শ্রীমতী কনিকা পাল

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ সমাজ সেবা সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত

এ.ই. ৪৬৭ সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ০৬৪

ফোন: ২৩২১-৫০৭৭/৫১২৩, মোবাইল: ৮০১৭২২৭০৯৯

E-mail: sreesreemohananandatrust@gmail.com / mohananandasamaj@gmail.com

মুদ্রণ: জয়শ্রী প্রেস, ৯১/১বি বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০০০৯। ফোন: ৯৮৩০১৮৮৭২৪

সূচীপত্র

সতাং প্রসঙ্গ	শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ	৫৭
গীতার মর্ম	শ্রীদেবপ্রসাদ রায়	৬০
শ্রীশ্রীবালানন্দের ঈশ্বরী শ্রীশ্রীবালেশ্বরী মা	শ্রীসোমনাথ সরকার	৬২
অবনীমোহনিয়া মোহনানন্দজী	শ্রীপিনাকী প্রসাদ ধর	৬৫
লহ প্রণাম	(শ্রী) রেবন্ত বসু	৬৬
পুণ্য-পরশ-পুলক (২৪শ পর্ব)	শ্রীবসুমিত্র মজুমদার	৬৯
অপ্রকটের দুই যুগ	শ্রীগুরুচরণাশ্রিতা কণিকা পাল	৭২
খড়দহে রামকৃষ্ণ, নিত্যানন্দপ্রভু ও রাধাশ্যামসুন্দর	শ্রীমতী রাধা বসু (সংগৃহীত)	৭৩
শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ		৭৭
শরণম শরণম গুরুচরণম	শ্রীমতী রীণা মুখোপাধ্যায়	৭৯
দেওঘর ও অন্যান্য আশ্রম সমূহের উৎসবের অনুষ্ঠান সূচী		৮১-৮২
অয়ি গিরিনন্দিনী (সম্পাদকীয়)		৮

পরম শুভানুধ্যায়ী জনৈকা শিষ্যা

সতাং প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ

প্রশ্ন, সমাজের সংশোধনের উপায় কি? সর্বস্তরে আজ যে -ব্যাপক দুর্নীতি দেখা দিয়েছে তার থেকে **মানুষকে কেমন** করে বাঁচান যায়?

উত্তর, সকলেই তো সে কথা ভাবছেন। মনে হয় মানুষ তৈরীর যে আদ্য পাঠশালা সেই মাতাপিতার **সাহচর্য** প্রভাবের উপরই এখন সর্ব্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। তাঁরা যদি সন্তানের চরিত্র গঠন না করে **কিসে** শুধু অর্থকরী বিদ্যা হবে তাই শেখান, সন্তানের সামনে ন্যায় নীতি বিরোধী আচরণ, দুর্নীতি ও অনাচারকে প্রশ্রয় দেন তবে সেই সন্তান বড় হয়ে কি ধরণের মনোবৃত্তির **অধিকারী** হবে? স্কুল কলেজের শিক্ষার পূর্ব্বে মাতাপিতার প্রত্যক্ষ সাহচর্যে যে শিক্ষা আমরা তা আমাদের চিত্তে গভীর রেখাপাত করে। এবং ভবিষ্যতে আমাদের সেইভাবেই যথাযথ কর্মে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দেয়। প্রত্যেক মাতাপিতাই সুনাগরিকের সংগঠক।

প্রশ্ন—সংস্কৃত চর্চ্চা, বেদপাঠ চর্চ্চা প্রভৃতির পুণঃ প্রবর্তনের দ্বারাও তো কিছু **সুফল** হতে পারে?

উত্তর—সংস্কৃত ভাষা **শিক্ষা,** ও বেদচর্চ্চার এখন বড়ই দুর্দশা দেওঘর আশ্রমের বিদ্যালয়ে বেদবিভাগের ছাত্রদের জন্য ৩০/৪০ **টাকা বৃত্তি** দেওয়া হয়। তবুও তাদের শেখা নেই, উৎসাহ নেই। এমনকি দুই

একটি বৃত্তিলোলুপ ছাত্র ছাড়া **শিক্ষার্থী** পাওয়া যায় না। এখন সমাজে, রাষ্ট্রে, জীবনে কোথাও সংস্কৃত ভাষার বেদচর্চ্চার স্থান নেই। সংস্কৃত শিখে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করতে পারবে না। উপবাসী হয়ে আদর্শ **রক্ষা** করা কি সম্ভব? রাষ্ট্র যদি এর মর্যাদা না দেয়, উৎসাহ না দেয়, ক্ষেত্র প্রস্তুত না করে তবে জীবনে এর মূল্য কি? এইভাবে সব দিক থেকে আনুকুল্য না পেয়েই আমাদের জীবন থেকে আমাদের প্রাণকেন্দ্র, উন্নতির মূলকে বর্জ্জন করে চলেছি। যাকে অতি যত্নে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার কথা, তাকেই অবহেলা করে দূর করে দিচ্ছি। অন্য ধর্মের প্রচারকরা যখন আসেন ; হাতে প্রচুর টাকা, কতরকমের লোভের জাল তাঁরা বিস্তার করেন, হিন্দুধর্মের ছিদ্রগুলি নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন তবু বিড়লা হিন্দুধর্মের রক্ষা ও প্রচার- কল্পে অনেক কিছু করেছেন কিন্তু একা কেউ এই বিপুল ধর্ম রক্ষা করতে পারে না, সমগ্রভাবে জাগরণ ও প্রচেষ্টা দরকার।

প্রশ্ন—বহুজনের কাছে শুনি মন্ত্রদীক্ষা লোকের একবারই এবং শাস্ত্রের নাকি একবারই হতে পারে এবং শাস্ত্রেও নাকি তাই বিধি আছে যে **দীক্ষা** গুরু একজনই হয়। আপনি তো বহুজনকেই দীক্ষা দান করেন; যাঁহারা পূর্ব্বে কুলগুরুর কাছেই আমার মনে হয় ইহার সঠিক নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেছেন। ব্যাখ্যা আপনার নিকটই পাইব। আপনি তো অশাস্ত্রীয় কর্ম করেন না। তাই এই বিষয়ে শাস্ত্রোক্ত বিধান জানতে ইচ্ছুক কারণ আমিও ঐ দলভুক্ত।

উত্তর—'গুরু' শব্দের ব্যাপক অর্থ আছে। যাহার নিকট হইতে কোন শিক্ষা পাওয়া যায় তিনিই সেই

বিষয়ে শিষ্যের নিকট গুরু হইতে পারেন। কলা, শিল্প, বিদ্যা, শাস্ত্র, শস্ত্র, ক্রীড়া; সব ক্ষেত্রেই শিক্ষক, শিক্ষণ, ও শিষ্যের প্রয়োজন হইতে পারে। কেবল মন্ত্রদাতাকেই বা আধ্যাত্মক্ষেত্রে পথ প্রদর্শককেই গুরু বলা যায় না। গীতাতেও মন্ত্রগ্রহণ না করেও অর্জ্জুন নিজের সন্দেহ ভঞ্জনার্থে বলিলেন "শিষ্য স্তেহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নমদ, আমি আপনাতে প্রপন্ন, আপনি আপনার এ শিষ্যকে অনুশাসন দ্বারা পরিচালন করুন।' দীক্ষা গুরুও একাধিক হইতে পারে। শাস্ত্রে আছে

"মধুলুকে। যথাভৃঙ্গ পুষ্পাং পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ
জ্ঞানলুব্ধো তথা শিষ্যঃ গুরো গুর্ব্বান্তরং ব্রজেৎ।"

মধুমক্ষিকা যেরূপ মধুলোভে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমন করে, জ্ঞানলুব্ধো শিষ্যও সেইরূপ এক গুরু হইতে অন্যগুরুর আশ্রয় লইতে পারে। বস্তুতঃ উপনিষদে আছে কোন এক ঋষির ১২০০ গুরুকরণ হইয়াছিল। কুলগুরুরও গুরুপদবাচ্যের লক্ষণ ও গুণ থাকা আবশ্যক। বর্ত্তমানে অনেকেই কুলগুরুর আচার, বিচার, প্রতিপালন করেন না। যজন, যাজন, অধ্যয়ণ, অধ্যাপন, দাম, প্রতিগ্রহ, ইহাই কুলগুরুবাচ্য ব্রাহ্মণদের পক্ষে বিহিত আছে। বর্তমানে বংশপরম্পরা কুলগুরুর প্রথা বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলেই চলে। কারণ এক্ষনে সেই বংশোদ্ভবগণ এমন কর্তব্যকর্ম্মে লিপ্ত থাকেন, যাহা কুলগুরুর পক্ষে বিহিত নহে, সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র গতানুগতিক নিয়মরক্ষার জন্য মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কুলগুরুকে স্বীকার করিলেও তাহাতে শিষ্যের প্রবোধন হইবে কিনা সন্দেহ হয়। কারণ মন্ত্রদাতাকে সেই মন্ত্রের সাধনায় তৎপর থাকিতে হয়। বর্তমানে অনেকে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াও বেদ বা গায়ত্রীর অনুশীলনও করেন না। সুতরাং গুরু বা শিষ্য লক্ষণ কিঞ্চিৎ শাস্ত্রসম্মত না হইলেও দীক্ষার কোন ফলোদয় হয় বলিয়া মনে করি না। দীক্ষা গ্রহণ আবার শিষ্যের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। যার প্রতি শিষ্যের শ্রদ্ধা নাই, যার আচার বিচারের প্রতি শিষ্যের বিশ্বাস নাই, তাঁর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণে কি ফলোদয় হইতে পারে? সুতরাং বৈদিক ও তান্ত্রিক গুরু পরম্পর কুলগুরুর প্রথা বর্তমানে নাই বলিলেও চলে। এক্ষণে বহু সম্প্রদায়, বহু সাধনার অভিনব প্রবর্তন দেখা যাইতেছে। অনেকেই নূতন নূতন শাস্ত্র ও অনুশাসন রচনা করিয়া নিজ সম্প্রদায় প্রবর্তন করিয়াছেন ও করিতেছেন। সুতরাং সনাতন পরম্পরা ক্রমে কোন বিধানই বর্তমানে যুগোপযোগী নহে। "শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষঃ যো যচ্ছুদ্ধঃ স এব সঃ" শ্রদ্ধাই অধ্যাত্ম প্রগতির মূল। "অশ্রদ্ধয়া নৃতং স্বক্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ, অসদিত্যুচ্যতে পার্থন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ"। শ্রদ্ধাবিহিত যজ্ঞ তপঃ বা যাহা কিছু করা যায় সবই অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা। ইহ ও পরকালের কোন কল্যাণই সাধন করিতে পারে না। তবে একটি কথা। মন্ত্র যদি শাস্ত্রসম্মত ও সিদ্ধ হয় তবে যে কোন নিষ্ঠাবান্ সাধন তৎপর বা সিদ্ধ পুরুষের মুখারবিন্দ হইতে শ্রবণ করিয়া সাধক নিজ সাধনায় দৃঢ় অভ্যাস দ্বারা সেই মন্ত্রই সিদ্ধরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন। সেক্ষেত্রে কুলগুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণের পর আর অন্য গুরুকরণের প্রয়োজন থাকে না। দ্বিজগণের পক্ষে যজ্ঞোপবীতকালীন যে গায়ত্রী মন্ত্র দেওয়া হয় তাহাই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র। পিতা, আচার্য বা কুলগুরুর নিকট গায়ত্রী দীক্ষা লওয়া হয়, তথাপি পুনঃ অন্য গুরুর নিকট হইতে মন্ত্রান্তর গ্রহণের বিধি আছে। সুতরাং দেখা যায় কুলগুরুর নিকট হইতে দীক্ষালাভ করিলেও যদি সেই দীক্ষা গ্রহণে ফলোদয় অভিমত কল্যাণ লাভ না হয় তবে আত্মকল্যান লাভের জন্য সাধক বা শিষ্য নিজ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অনুকূল অন্যগুরুর নিকটেও সেই মন্ত্রই বা অন্য মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারেন।

প্রশ্ন—গুরুকরণের প্রয়োজন কি প্রত্যেক মানুষের জন্যই?

উত্তর—'গুরু' শব্দটি প্রয়োগ না হইলেও শিক্ষক ও শিষ্য সম্বন্ধ দ্বারা জ্ঞান লাভের বা প্রশিক্ষণ লাভের প্রথা সার্ব্বভৌম খৃষ্টান, মুসলমান, ইহুদী, পারসী, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকল মনুষ্যের মধ্যেই আধ্যাত্মচেতনার আরম্ভ হইলেই এই সম্বন্ধ পরি- গৃহীত হইতে বাধ্য। হিন্দু শাস্ত্রে গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করা অধ্যাত্মজগতে প্রবেশেচ্ছু ও আত্মকল্যাণকামী প্রতি হিন্দুর জন্যই আবশ্যক বলিয়া বিহিত হইয়াছে। এমনকি গুরুমন্ত্র লাভ না হইলে শরীর শুদ্ধ হয় না এবং পারলৌকিক কল্যাণময়ী গতি লাভ হয় না এরূপ শাস্ত্রের নির্দেশ রহিয়াছে খৃষ্টানগণও শিশু জন্মগ্রহণের অত্যল্প পরেই তাকে Baptise করেন। এই সংস্কারও মন্ত্রপূত জলদ্বারাই সাধিত হয়। Unbaptised soul এর গতি হয় না, Heatren বলিয়া অভিহিত হয়েন।

প্রশ্ন—মৃত্যু চিন্তা করা কি পাপ? আত্মহত্যা তুল্য? বাঁচার মত বাঁচা যার হল না, জীবন যার সার্থকতার স্বাদ পেলো না সে কি ভালো জন্মজীবনের প্রার্থনায় মৃত্যু কামনা করতে পারে না?

উত্তর—কর্ম্মাশয়কে বিত্ত, আয়ুঃ ও ভোগ এই ত্রিবিধভাবে বর্ণিত হইয়াছে পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে। সুতরাং দেহ ধারণ করার অবধি কর্ম্মাশয় দ্বারাই নির্ণীত হইয়াছে। সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য বিরহিত বিড়ম্বনা পূর্ণ জীবনেও ভোগ ও আয়ুঃ ক্ষয় হইয়া যায়। সুতরাং নির্দ্দিষ্ট ভোগ নিঃশেষ না করিয়া জীবনপাত হইলে সেই ভোগের অবশেষ থাকিয়া যাইবে, যাহা আরও মর্মান্তিক হইতে পারে। আত্মহত্যা দ্বারা আপাত প্রতীয়মান দুঃখ ও দুর্ভোগের নিবৃত্তি হইলেও প্রেতলোকে বা পরজন্মে হয়ত অধিকতর ভোগের জের টানিয়া আনিতে হইবে। সুতরাং মৃত্যু চিন্তা না করিয়া ভগবৎচিন্তা, সৎচিন্তা ও সদাচার দ্বারা দুর্ভোগের মধ্যেও ঈশ্বর প্রপন্ন হইতে পারিলে পরিশেষে শান্তি হইতে পারে।

"যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেহমৃতোপমম্
তৎ সুখং সাত্তিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধি প্রদাদজম্"

আমাদের ভোগের জন্য আমরাই দায়ী। "অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম"। কৃতকর্ম্ম ফল নিঃশেষ হইয়া গেলেই মৃত্যু শান্তি আনিতে পারে। আত্মহত্যাকে সর্ব্বদেশেই আইন বিরুদ্ধ, যুক্তি ও বিবেক বিরুদ্ধ বলিয়া নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। দুরারোগ্য তীব্র বেদনাদায়ক রোগের ভোগ হইতে আপাতঃ মুক্তিলাভের জন্যও আত্মহত্যা করা বিহিত নহে। বরং সহ্য শক্তি দ্বারা, অনুশোচনা ও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা যাহাতে ভবিষ্যতে এরূপ দুর্ভোগ না সহন করিতে হয় তজ্জন্য চেষ্টিত থাকা প্রয়োজন।

ooo

আমরা সকলেই যজ্ঞ বা ত্যাগ সাধনার জন্য সৃষ্ট হইয়াছি, ভোগের জন্য নয়। ভোগবৃত্তি মানুষকে অসুর করে পক্ষান্তরে ত্যাগবৃত্তি মানুষকে দেবতা করিয়া থাকে। দেবতার লীলায়তনই হইল মনুষ্য দেহ।

গীতার মর্ম (পরবর্তীঅংশ)

শ্রীদেবপ্রসাদ রায়

সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষু/র্ণ লিপ্যতে
চাক্ষুষৈ বহ্যি দোষৈঃ
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ।।

কঠ ২/২/১১

সূর্য যেমন সমস্ত জগতের প্রকাশক হয়েও জগতের বাহ্যদোষে লিপ্ত নন, সেইরকম এক অদ্বিতীয় সর্বভূতে বিরাজমান আত্মা বাহ্যদোষে লিপ্ত হননা। অতএব বীরপুরুষ আপনাকে ব্রহ্মাত্মস্বরূপে জেনে শোকদুঃখের উপাদান স্বরূপ অজ্ঞানের নিবৃত্তি করে অদ্বিতীয় পরমানন্দ রূপমোক্ষ লাভ করে থাকেন/আত্মা সদাই মুক্ত। অন্তঃকরণের ধর্ম আত্মাতে ভুল করে আরোপিত হয়।

চিৎস্বরূপ আত্মার যে প্রতিবিম্ব বুদ্ধিরূপ দর্পনে পড়ে যাকে চিদাভাস বলা যায়— তিনিই উপাধিযুক্ত হয়ে বদ্ধ বলে প্রতীত হন আবার জ্ঞানোদয়ে তিনিই উপাধিযুক্ত হয়ে স্বপ্রকাশ রূপে অবস্থান করলে মুক্ত বলে বোধ করেন। আসলে আমার বন্ধন কিংবা মুক্তি কিছুই নেই। বুদ্ধি রূপ উপাধির জন্যই তার বন্ধন ও মুক্তি।

পুরুষ—যিনি পূর্ণ বলে পুরে-সর্বজীব
শরীরে শয়ান অর্থাৎ অধিষ্ঠিত।
'স বা অয়ং পুরুষঃ সর্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ো নৈনেন
কিঞ্চনাসংবৃতং নৈনেন কিঞ্চনা সংবৃতম্।।

(বৃ উ ২/৫/১৮)— অর্থাৎ সেই পুরুষ সমস্ত পুর (শরীর) মধ্যে যা পুরে শয়ান (অধিষ্ঠিত) রয়েছেন। আবার অন্য জায়গায় শ্রুতি বলেছেন—

কর্মেন্দ্রিয়ানি খলু পঞ্চ তথাহপরানি
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি মন আদি চতুষ্ঠয়ং চ প্রাণাদি পঞ্চ।।
কমথো/পঞ্চ কমথো রিয়দাদিকম্ চ কামশ্চ কর্ম চ
পুনবষ্টমীপুঃ।। (১) কর্মেন্দ্রিয় (বাক প্রাণিপাদপায়ু উপস্থ), (২) জ্ঞানেন্দ্রিয় (শ্রোত্র চক্ষু নাসা জিহ্বা, ত্বক্)
(৩) অন্তঃকরণ-মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার),
(৪) প্রাণ-প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান,
(৫) ভূত-ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম;
(৬) কাম, (৭) কর্ম, (৮) তমঃ (অবিদ্যা)— এই অষ্টপুরে যিনি বাস করেন, তিনিই পুরুষ।
নাসতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ।

উভয়োরপি দৃষ্টোহন্তস্তনয়োস্তত্ত্ব দর্শিভিঃ।।২/১৬

অসতঃ অসৎ পদার্থের। ভাবঃ— অস্তিত্ব।

অভাবঃ-বিনাশ।

যে পদার্থ অসৎ, তার বিদ্যমানতা কোন কালে নেই এবং যা সত্য তার অভাবও কোন কালে নেই। তত্ত্বদর্শী পুরুষগণ এইরূপে সদসৎ উভয়ের নিরূপণ করেছেন।।

ব্যাখ্যা— যা দেশ কাল ও বস্তু পরিচ্ছেদের অধীন, তাই অসৎ। অর্থাৎ যা অন্যত্র নেই, এখানে আছে। দেশ-পরিচ্ছেদের জন্য তা অসৎ যা পূর্বে ছিল না এখন রয়েছে, কিন্তু পরে থাকবে না, তা কাল-পরিচ্ছেদের অধীন. সুতরাং অসৎ। সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত-এই তিন রকম ভেদের নাম বস্তু-পরিচ্ছেদ। আমগাছ আর নিমগাছে যে ভেদ, তাকে সজাতীয় ভেদ বলে। পাষাণ ও বৃক্ষে যে ভেদ, তার নাম বিজাতীয় ভেদ ও একই গাছের শাখা, পত্র, পুষ্পাদির মধ্যে যে ভেদ দেখা যায়, তা স্বগত ভেদ। এ ছাড়া জীব ও ঈশ্বরে ভেদ, জীব ও জগতের ভেদ, জীব সকলের পরস্পরের ভেদ, ঈশ্বর ও জগতের ভেদ এবং জগতের পরস্পর ভেদ অর্থাৎ জাগতিক পদার্থের পরস্পর ভেদ এই পাঁচ রকম বস্তু পরিচ্ছেদ। কোন রূপ ভেদ যেখানে দেখা যায়, তা অসৎ।

কারণের কারণরূপে বিদ্যমান বিশুদ্ধ সত্তামাত্র সৎ এবং অবস্থা বিশেষে, সময় বিশেষে, দেশ বিশেষে, পাত্র বিশেষে অনুভূত, প্রকাশিত বা আবির্ভূত সমস্ত ব্যাপারই অসৎ।

Resist not evil আমরা দুঃখের প্রতিরোধ করি, কারণ তারা আমাদের দেহে ও মনে যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। কিন্তু তারা যে অনিত্য একথা মনে থাকে না এবং বর্তমান জীবনটাকেই অনন্ত কালস্থায়ী বলে মনে হয়। তত্ত্বজ্ঞান বা মোক্ষ (মোহক্ষয়) মানে সুখ-দুঃখের হাত হতে নিস্তার পাওয়া। যতদিন না এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হবে, ততদিন একটি দুঃখ জয় করলেই আর একটি দুঃখ তার স্থান অধিকার করে। এই অভিজ্ঞতার বিস্মৃতির জন্য আমরা দুঃখের প্রতিরোধ করি, এইজন্য Christ বলেছিলেন— "But I say unto you that ye resist not evil, but what so ever shall suite thee or thy, right chick, turn to him the other also",

New Testament St. Mathew, আমি বলি তোমরা দুষ্কৃতকারীকে বাধা দিওনা। যদি কেউ তোমার ডানগালে চড় মারে, তাহলে তার দিকে অপর গালও বাড়িয়ে দাও।

আরো আঘাত সইবে আমার, সইবে আমারো।
আরো কঠিন হয়ে জীবন-তারে ঝঙ্কারো।
যে রাগ জাগাও আমার প্রাণে বাজেনি তা চরম তানে
নিঠুর মূর্ছনায় সে গানে মূর্তি সঞ্চারো।
লাগোনাগো কেবল যেন কোমল করুণা
মৃদু সুরের খেলায় এপ্রাণ ব্যর্থ-কোরোনা।
জ্বলে উঠুক সকল হুতাশ গর্জি উঠুক সকল বাতাস
জাগিয়ে দিয়ে সকল আকাশ-পূর্ণতা বিস্তারো।।

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি।। ২/১৭

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীবালানন্দের ঈশ্বরী শ্রীশ্রীবালেশ্বরী মা

(ভক্তের অনুভবে পঞ্চম পর্ব)

শ্রীসোমনাথ সরকার

আমরা শ্রীশ্রীবালেশ্বর্যষ্টকং স্তোত্রম্ এর দ্বিতীয় শ্লোকে দেখি—

"চতুর্ভুজা যা বরগৌরকান্তি
হিতং জনানামনুচিন্তয়ন্তী।
প্রসন্নবক্ত্রা সুরবৃন্দবন্দ্যা,
বালেশ্বরীং তামহমানতোহস্মি।" (২)

আমরা প্রথম পর্বের প্রথম শ্লোকে দেখেছি, আমাদের দেবী মা, শ্রীশ্রীবালেশ্বরী মা চতুর্ভুজা। তাঁর চারি হস্তে অক্ষমালা, চতুর্বেদ, বর ও অভয়মুদ্রা। দেবীর এক রূপ স্বয়ং গায়ত্রী স্বরূপা, তাই তাঁর হস্তে অক্ষমালা। তিনি স্বয়ং আদ্যাশক্তি। জগতকে বিদ্যা বা জ্ঞান প্রদান করছেন। তাই তাঁর হস্তে চতুর্বেদ। সমস্ত জ্ঞান দেবীর থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং দেবী তা বেদের মাধ্যমে সাধককে প্রদান করছেন।

চতুর্বেদ-এর অন্তর্গত ঐতরেয় উপনিষদের মহাবাক্য, "প্রজ্ঞানম্ ব্রহ্ম", যজুর্বেদ-এর অন্তর্গত বৃহদারণ্যক উপনিষদের মহাবাক্য "অহং ব্রহ্মাস্মি", আমিই ব্রহ্ম, প্রজ্ঞানম্ অর্থাৎ প্রজ্ঞা বা চেতনাই ব্রহ্ম, সামবেদের অন্তর্গত ছান্দোগ্য উপনিষদ এর মহাবাক্য, "অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম", এই আত্মাই ব্রহ্ম।

দেবী তাঁর সাধককে অভীষ্ট বর প্রদান করেন। দেবীর অভয় সাধকের প্রতি সর্ববিপদে দেবী রক্ষা করেন।

দেবী বরগৌরকান্তি। বর-উত্তম। গৌরবর্ণ বা গলানো সোনার মত উজ্জ্বল কান্তি। কাঁচা হলুদের মত বর্ণ। অষ্টম বর্ষীয়া দেবীর শোভা উজ্জ্বল সোনার মত রং।

"হিতম জনানামনুচিন্তয়ন্তী"

ত্রিভুবনের সমস্ত প্রাণীর মঙ্গল চিন্তা কারিনী দেবী। দেবী হচ্ছেন মা। ত্রিভুবনের সমস্ত প্রাণী দেবীর সন্তান। মা সর্বদাই সন্তানের মঙ্গল চিন্তাকারী। আমরা বারে বারেই তার প্রমাণ পাই। শ্রীশ্রীচণ্ডীর একাদশ অধ্যায়ে আমরা দেবী যখন দৈত্যরাজ শুম্ভকে বধ করলেন, তখন সমস্ত দেবগণ এক সঙ্গে দেবী নারায়ণীকে স্তব স্তুতি করতে লাগলে, দেবী তাঁদের বর প্রদান করতে উদ্যত হয়ে বলতেন, "দেবগণ, আমি তাহাই প্রদান করিব"।

শ্রীশ্রীচণ্ডী ১১।৩৭

আমরা বারে বারেই দেখেছি দেবগণ নানা সঙ্কটে পড়ে দেবীকে স্তব স্তুতির দ্বারা আহ্বান করে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করছেন এবং দেবী আবির্ভূত হয়ে নানা বর প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের এবং সমগ্র জগতকে

কে উদ্ধার করছেন।

"প্রসন্নবক্ত্রা" দেবী সর্বদাই প্রসন্নবদনে ও মিষ্টভাবে দেবগণকে আশীর্বাদ প্রদান করেছেন। "সুর বৃন্দ বন্দ্যা" সুর অর্থাৎ দেবগণ (দ্বারা) বৃন্দ (সকলে, সকল দেবতারা সম্মিলিতভাবে।) বন্দ্যা দেবীর বন্দনা করেন। বা দেবীমা দেবতাদের দ্বারা বন্দিত।

আমরা "শ্রীশ্রীচণ্ডীর" প্রথম অধ্যায়ে দেখতে পাই শ্রীশ্রী বিষ্ণুর নাভিকমল থেকে উৎপন্ন ব্রহ্মা যখন তাঁর আসন্ন সৃষ্টির চিন্তায় মগ্ন ছিলেন তখন শ্রীবিষ্ণুর কর্ণমল জাত মধু ও কৈটভ দৈত্যদ্বয় ব্রহ্মাকে বধ করে সৃষ্টিকে ধ্বংস করতে উদ্যত হলে, শ্রীশ্রীব্রহ্মা বিশ্বেশ্বরী দেবীকে স্তব করে বলতে লাগলেন যাতে মহামায়া শ্রীবিষ্ণুকে যোগনিদ্রা থেকে উত্থিত করেন এবং মধু ও কৈটভকে বধ করেন। (শ্রীশ্রীচণ্ডী ১ম অধ্যায় শ্লোক ৭২ থেকে ৮৭) এবং দেবী সমস্ত সৃষ্টির হিতের জন্য নারায়ণকে যোগনিদ্রা থেকে উত্থিত করে মধু ও কৈটভকে বধ করালেন।

আবার শ্রীশ্রীচণ্ডীর চতুর্থ অধ্যায়ে দেখি মহিষাসুর বধের পর শক্রদয় সুরগণাঃ-ইন্দ্রাদি দেবতাগণ দেবীর স্তুতি করছেন।

আবার পঞ্চম অধ্যায়ে দেখি শুম্ভ ও নিশুম্ভ দৈত্যদ্বয় যখন সমগ্র দেবকুলকে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করে তাদের অধিকার হরণ করলেন এবং সমস্ত যজ্ঞের ভাগসমূহ কেড়ে নিতে শুরু করলেন, তখন দেবতারা মহাদেবীকে স্তব করে তাঁদের রক্ষা করতে বললেন।

এইভাবে বারে বারেই দেবী আমাদেরকে রক্ষা করবার জন্য "বালেশ্বরীং তামহমানতহস্মি।" সেই দেবী বালেশ্বরীকে তাম— সেই, অহম্ আমি, আনতহস্মি— নত হয়ে প্রণাম জানাই।

আনত-নত, অস্মি—হই (প্রণাম জানাই)

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে আমরা একটি কাহিনী পাই। একবার ঋষি অগস্ত্যর মনে প্রশ্ন জাগে কে এই দেবী ললিতা ত্রিপুরাসুন্দরী? তাঁর এই ললিতা সহস্রনামের মাহাত্ম্যই বা কী? তিনি তখন এটা জানবার জন্য জয়গ্রীব ভগবানের তপস্যা করেন।

জয়গ্রীব ভগবান, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অবতার। কিন্তু তাঁর মস্তক ঘোড়ার ন্যায়। তাঁকে জ্ঞানের দেবতা বলা হয়। তিনি জানান পুরকালে ভণ্ডাসুর নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত অসুর ব্রহ্মার সৃষ্টিকে বিনষ্ট করতে উদ্যত হলে, পুরো ব্রহ্মাণ্ড যখন ভয়ঙ্কর সঙ্কটের মুখোমুখি হয়, তখন সকল দেবাতারা মিলে ভণ্ডাসুরকে পরাজিত করবার জন্য যুদ্ধ শুরু করে, কিন্তু ভণ্ডাসুরের প্রবল পরাক্রমে তাঁরা পরাজিত ও স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হলেন।

তখন সমগ্র পরাজিত দেবতারা তাঁদের এবং সমগ্র সৃষ্টি রক্ষা করবার জন্য এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ দিব্য আদ্যাশক্তির কাছে এক স্তবের মাধ্যমে প্রার্থনা করেন। তাঁদের প্রার্থনা শুনে আদ্যাশক্তি তাঁদের আশ্বাস প্রদান করেন ও অলৌকিক সুন্দর শ্রীললিতা ত্রিপুরাসুন্দরী রূপে প্রকট হয়ে এক ভয়ঙ্কর ব্রহ্মাণ্ডীয় যুদ্ধে ভণ্ডাসুরকে বিনাশ করেন। জয়গ্রীব ভগবান বলেন ঋষি অগস্ত্যকে যে এই ললিতা সহস্রনাম কোনো সাধারণ স্রোত্র নয়। এই জ্ঞান স্বয়ং মা ললিতা দেবীর আদেশে প্রাপ্ত এবং এর রচনা করেছেন অষ্ট বাগদেবী এবং স্বয়ং মহাগণেশ এই সহস্রনামকে প্রচারের জন্য অনুমোদন করেছেন। জয়গ্রীব ভগবান বলেন এই সহস্রনাম শুধুমাত্র নামই নয়। এর প্রত্যেকটা নাম দিব্য এবং এর দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড রচনার

নকশা বা চিত্র পাওয়া যায়। ঠিক যেমন বর্তমান বৈজ্ঞানিকদের অঙ্ক বা বিজ্ঞানের সূত্রে (Formula) পাওয়া যায়। জয়গ্রীব ভগবান ঋষি অগস্ত্যকে পৃথিবীতে এই নাম প্রচার করতে আদেশ করেন। আসলে ভণ্ডাসুরের সঙ্গে এই যুদ্ধ কেবলমাত্র বাহিরে ব্রহ্মাণ্ডে দেবীর সঙ্গে অসুরের যুদ্ধ নয়। সাধকের অন্তরে অজ্ঞান ও অহঙ্কারের লড়াইতে অজ্ঞানকে নাশ করাই এই যুদ্ধের প্রতীক। ভণ্ডাসুর আমাদের অন্তরের অজ্ঞান ও অহঙ্কারের প্রতীক। ললিতা—ত্রিপুরাসুন্দরীর আরাধনা ও ললিতা সহস্রনামের মাধ্যমে অজ্ঞান কে নাশ করে সাধককে মুক্তি দেওয়াই মায়ের কৃপা।

ooo

শ্রীগুরু স্মরণে

শ্রীমতী সোমা মুখোপাধ্যায়

শ্রীগুরু চরণ পদ্ম স্মরি মনে মনে।
সহস্রকোটি প্রণমিনু তাঁহার চরণে।।
শ্রীগুরুর চরণ পদ্ম করিয়া স্মরণ।
চতুর্বর্গ ফললাভে লভি অনুক্ষণ।।
হে গুরু তুমিই ব্রহ্ম তুমিই বিষ্ণু।
তুমিই মহেশ্বর।
ঘুচাও মনের যত ক্লেশ ও বিকার।।
জয় হে গুরু জ্ঞান গুণের সাগর।
জয় হে কৃপাসিন্ধু বিষ্ণু অবতার।।
অহরহ তোমারে প্রণাম জানাই।
সদাই ঐ রাতুল চরণে পাই যেন ঠাঁই।।

অবনীমোহনিয়া মোহনানন্দজী (পরবর্তী অংশ)

শ্রীপিনাকী প্রসাদ ধর

ছোট্ট মেয়েটির খুব মনে আছে মহারাজজীর বাড়িতে আগমন মানেই সারাক্ষণ উৎসব, গান, ভাণ্ডারা, লোক জনের আওয়াজ, আর? বেড়াতে যাওয়া মহারাজজীকে মধ্যমণি করে ভক্তমণ্ডলী আর ছোট মেয়েটির পুরো পরিবার সে নিজেও চলে যেত কখনও বড়াপানি বা উমিয়াম, চেরাপুঞ্জি ডাউকি, নারতিয়াং, কাছাকাছির মধ্যে হ্যাপি ভ্যালি, বিডন-বিশপ, স্প্রেড ঈগলস ফলস। মহারাজজীর চোখ দিয়েই নতুন করে দেখা যেন বারবার দেখা এই সুন্দর জায়গাগুলো। ওদিকে মহারাজজী চলে যাবার সময় সবাইমিলে গৌহাটিতে এগিয়ে দিতে গিয়ে যাওয়া হত কাছাকাছির তীর্থস্থানগুলোতে। কামাখ্যা মন্দিরে যাওয়া এখনকার মত সহজ ছিল না একটুও। রীতিমত দুর্গম চড়াই আর অনেকটা উঁচু। থেমে থেমে উঠতে হয়। পড়ে যাবার ভয় সর্বক্ষণ। মহারাজজীর বিশেষ ভাল লাগার তীর্থ বশিষ্ঠ। এক পরম রহস্য-আঁধার এর গুহা মন্দিরে। ঋষি বশিষ্ঠের তপস্যা স্থল। তাঁর পুণ্যস্মৃতি যেন ছড়িয়ে, থমকে আছে এর শিলারাশিতে। সময়ের লম্বা হাতের বাইরে যেন সেই গুহার আবহ। আর আছে রাইনের প্রবল জল পতনকে মনে করিয়ে দেওয়া গুহার ঠিক বিপরীত দিকের অদম্য জলরাশি। কোন্ দূর থেকে নেমে আসছে উচ্ছল জল। পাথরে পাথরে ধাক্কা খেয়ে আবার ছুটে চলেছে কোন্ সুদূরে! তীব্র সেই সময় স্রোতের মধ্যে শিলাখণ্ড সমূহ যেন স্থির, ক্ষণশাশ্বত কিছু মুহূর্ত। মহারাজজী খুব ভালবাসতেন ওরকম একটি পাথরে বসে কীর্তন করতে। যেন সময়ের স্রোতে উর্ধ্বলোকে চলে যেত তাঁর ধ্যান, সঙ্গে আরও অনেক ভক্তের নিবেদন। ছোট্ট সর্ব্বাণী একবার সেই স্রোতে পড়েগিয়েছিল। তখন সে অবশ্য খুব ছোট নয়,— বারো তেরো বছর বয়স।

ছিল উমানন্দের শ্যামল শান্তি। ব্রহ্মপুত্রের বুকে নৌকোভাসিয়ে যেতে হয় সেখানে। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে কাছের দূরের বেশিরভাগ জায়গাই যেন ছুঁয়ে আসা হত। সবসময় নতুন কিছুর জন্য মন উৎসুক। সেবার ঠিক হল সোয়াই পার হয়ে সোনারপুরের কাছাকাছি মনোরম পাহাড়ি পরিবেশে হবে চড়ুইভাতি। দুর্গম পথ, মাঝে মাঝেই জঙ্গল পার হয়ে যেতে হয়। থমথমে অন্ধকার জঙ্গল দিনের বেলাতেও। সেও এক বাড়তি রোমাঞ্চ। খাবারটা তেমন কিছু নয়,— খিচুড়ি আর পায়েস। একটি আলাদা বাস; তাতে রইল রান্নার বাসনপত্র আর রসদ এবং কিছু বয়স্ক মানুষজনের সঙ্গে বালখিল্যদের একটি ছোট্ট দল। আর আছে জিপ—তাতে চলেছেন অবনীমোহনের আর তাঁর বন্ধুজনের পরিবার— সর্বসাকুল্যে সাত আট জন। বাড়ির গাড়িটায় মহারাজজী আর অবনীমোহন ছাড়া আরো জনাতিনেক যাত্রী।

আমাদের যাত্রা হল শুরু। ভোরবেলা কলকোলাহল, হাসিরাশি, যাত্রাপথের আনন্দ-গান-উচ্ছ্বাস,— এই করতে করতে যাওয়া হচ্ছে। বাসে অন্যদের সঙ্গে রয়েছেন পবিত্র দাশ। বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ, সঙ্গে অল্প বয়স্কদের দলে রয়েছে কিশোরী কন্যা ছন্দা। পবিত্রবাবুর একটা ছোট্ট ইতিহাস রয়েছে। সবাই জানতো তিনি ঘোর

পরবর্তী অংশ ৭১ পাতায়

লহ প্রণাম

(শ্রী) রেবন্ত বসু

"কী রাগিণী বাজালে হৃদয়ে, মোহন, মনোমোহন, তাহা
তুমি জান হে, তুমি জান।।
চাহিলে মুখপানে, কী গাহিলে নীরবে কিসে মোহিলে মন প্রাণ,
তাহা তুমি জান হে, তুমি জান।।
আমি শুনি দিবারজনী তারি ধ্বনি, তারি প্রতিধ্বনি।
তুমি কেমনে মরম পরশিলে মম,
কোথা হতে প্রাণ কেড়ে আন, তাহা
তুমি জান হে, তুমি জান।।"

১

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Free English translation of the above-mentioned Tagore - Song - What fascinating and ethereal silent-tune
Do you play within my heart, O Lord-
Only you, O God,
only you know that alone, It makes me so deeply happy Now that I know what remained unknown.
Our eyes met only once Your quiet music sent me into trance-
How you placed me
in a heavenly zone
Only you, O God,
only you know that alone.
All the day and all the night I hear your song
On my left and on my right In the sky and on the ground I hear the sound that does resound.
How could you enter and
conquer my heart
And always always keep me alert, How you tested me
with your touchstone
Only you, O God,
টীকা
only you know that alone.

ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীতে সমৃদ্ধ ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত অতি প্রসিদ্ধ। এদের যে বিবিধ মিড় তাল লয় ও ছন্দ বিশিষ্ট সুর তার অনুরাগী ও অনুরাগিণীর সংখ্যা দেশে-বিদেশে প্রচুর। কণ্ঠও বাদ্য উভয়ক্ষেত্রেই এদের অবদান অনবদ্য। এদের অসামান্যতা স্মরণে রেখেও এই কথাটি কিন্তু জানতে ও মানতেই হবে যে এরা প্রত্যেকেই মূলত কোনো বিশিষ্ট কালের বা ঋতুর বা ঘটনার আবেগের দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং তারই ভিতরে থেকে অথবা তাকেই অবলম্বন ক'রে এরা মানুষের অন্তরের বিভিন্ন অনুভূতিকে মন্তরের মতো রূপ দিয়েছে যা গেয়ে বা বাজিয়ে আমরা আমাদের ভাবনাগুলিকে এক আশ্চর্য ঐশ্বর্যে সাজিয়ে নিই।

'সূর্যদেব, এর পূরবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ ক'রে চলে যাক' মহাকবির অনুসরণে এই যে কবি বিষ্ণু দে-র ডাক, এখানে পূরবী হলো অস্তমিত রবি, আসন্ন বিষণ্ণ বেলা, তখন মনের মাঝে যে বিহ্বলতা আর বিদায়বেলার আকুলতার ক্লান্তিকর খেলা তারই যেন সুর-বাজে সুদূর সেই ছেলেবেলার স্মৃতি, বাজে বিধুর সব না-পাওয়ার গীতি, বাজে নম্র মধুর হয়ে ভালো-মন্দের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের রূপগন্ধের অটুট সম্প্রীতি। আর বিভাস হলো আলোর উদ্ভাস, নব জীবনের অদম্য উল্লাস, নাই লাজ, নাই সন্দেহ, নাই কোনো ত্রাস। অধীর শরীর, তাজা প্রাণ মন, সংগ্রাম আর উদ্দাম প্রাণপণ, এই ব্যক্ত করে যেন বিভাসের তান, এক অদ্ভুত জেগে উঠে ভালোলাগার গান, তারই সঙ্গে রয়েছে শ্রদ্ধা আর প্রণতি, তাঁর প্রতি যিনি এই জগৎ-কে দিয়েছেন জ্যোতি।

আবার প্রভাতেরই অন্য সুরে গম্ভীর করুণভাবের ছায়া দেখেছেন মহাকবি, লিখেছেন, 'সকালবেলার আলোয় বাজে বিদায়বেলার ভৈরবী।' ইমনেও তিনি দেখেছেন বিয়োগ-ব্যথা ঝরে: 'ইমনে আর বাঁশি বাজে, মন যে কেমন করে।' মূলতানেও সেই বেদনা, 'তখন ঝিকিমিকি বেলা/করুণ ক্লান্তি লেগেছে মূলতানে' - আচ্ছন্ন হয় যেন চেতনা। এমনি বিরহের সুর খাম্বাজে অথবা সিন্ধু বারোয়াঁয় - সর্বত্রই সুর বাঁধা স্নিগ্ধ বেদনায়। আবার অন্য রাগিণীতে আগমনের আনন্দের পূর্ণতার সুর, যেমন আগমনী গানের জন্য আছে রামকেলি ও ললিত বিভাস, নবান্নের জন্য ধান্যশ্রী, মিলনের জন্য কাফি বা সাঁহানা, 'ধরো সাহানাতে মিলনের পালা, সাজাও যতনে বরণের ডালা' মধুর, মধুর। সুখদুঃখ দুটি ফুলেই গাঁথা হয়েছে রাগরাগিণীর মালা, ভরে উঠেছে সঙ্গীতের ডালা।

বিভিন্ন ঋতুর জন্য বিভিন্ন রাগরাগিণীর প্রচলন এখানে সুপ্রাচীন। এখানে তারা অবশ্যই কিছুটা পরাধীন, গ্রীষ্মের মন সারঙ জানে, 'ধূসর বরণ হে বৈশাখ, তৃষ্ণা-করুণ সারঙ-তানে'; মল্লার, নটমল্লার, মেঘমল্লার, মেঘ, এগুলিতে ঝরে পড়ে বর্ষার আবেগ, 'মেঘ মল্লার রাগিণী, এসেছে বরষা ওগো নব অনুরাগিণী'; আবার বসন্তের জন্য আছে

যারা, যেমন বসন্ত, বসন্তবাহার বা বসন্তপঞ্চম তারা কেউ কারো থেকে নয় কম, 'সাধ যায় বসন্তের গান গাহিবারে ..... সহসা পঞ্চম রাগ আপনি সে বাজে।' অর্থাৎ আমাদের সকল প্রকার সঙ্গীতের কাজে রাগ-রাগিণীর বাহিনী প্রস্তুত, আশ্চর্য অদ্ভুত। তারা বিধুর, তারা মেদুর, তারা সোনালি, তারা রুপালি - 'ওলো শেফালি, আমার সাঁঝে বাজে তোমার করুণ ভূপালি।*

ভূমিকাটি হয়ে গেল দীর্ঘ, তার লাগি হই নতশির গো। আসলে বোঝাতে চাই দেশেরই সঙ্গীতের থেকে আমাদের নেই কোনো কমতি, কিন্তু বোধহয় তাদেরই মতো এরও যেন একটিই খামতি, স্থান কাল

পাত্রতে বাঁধা সে, তাই জগতের চিরন্তন ধাঁধা যে, যতই সে চাক তাকে খুঁজতে, কোনোদিন পারেনি তা সম্যকভাবে যেন বুঝতে।

যখন ছিলাম আমি মুহ্যমান সংসারের দুঃখ আর শোকে, তোমার চকিত দৃষ্টির প্রসাদ আমায় নিয়ে গেল এক অন্য লোকে, দিল অমর্ত্যের আস্বাদ, সেখানে সকলি ভরা আলোকে আলোকে। তুমি এসে কানে নয় এই প্রাণে শোনালে যে গান, তার নেই কোনো বিশিষ্ট লয় তাল মিড় তান অথবা বিস্তার। তাতে নেই ভাষা, নেই শব্দ, মহারহস্যেরই মতো সে স্তব্ধ, তাতে নেই পিপাসা, নেই আশা-নিরাশা, আছে শুধু অন্তহীন অতল বিস্ময় , কি করে এই নিস্তব্ধ সঙ্গীত এমন প্রাণস্পর্শী হয়!

Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter, কীটসের এই রোমান্টিকতার সারাৎসার হলো এই যে কল্পনার কোনো সীমানা থাকে না, কেউ বা কিছুতে তাকে আটকে রাখে না। তুমিও তেমনি প্রভু ভাষা বা সুরের জালে আপনার মনটাকে বদ্ধ ক'রে রাখনি তো কভু,

দ্রষ্টব্য: উচ্চাঙ্গ ভারতীয় সঙ্গীতানুরাগী রবীন্দ্রনাথ (রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা), শান্তিদেব ঘোষ এই তোমার ঐ মনোমোহন নীরব সঙ্গীত কাঁপিয়ে দিল আমার জীবনের ভিত, আমার সকলি গেল যেন হারিয়ে, আমি নিজেকে গেলাম যেন ছাড়িয়ে, তোমার নয়নে দেখি যেন অনন্তের উর্বর ভূধর, এক নয় দুই নয় অন্তহীন স্তর - সবার ঊর্ধে সমাসীন সুপ্রাচীন তোমারই অবয়ব, কল্পনাই হয়ে যায় তখন বাস্তব। তোমার করুণায় বোধকরি সকলি সম্ভব। আমার জীবনের যত কলরব হলো যেন শব্দহীন স্তব, যুক্তি নয়, তর্ক নয়-শুধু অনুভব।

তোমার ও নীরব সঙ্গীতে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ভঙ্গিতে দেখা দিল আমার স্বার্থপুষ্ট দুষ্ট সংসার, অকস্মাৎ মনে হলো যেন তার সকলি অসার; অতল অপার এক বিষাদের আস্বাদ এনে দেয় আর সবই যদি তাতে না দেখতে পাই তোমার প্রতিচ্ছবি। আমার সকাল-বিকাল, আমার ত্রিকাল ভরে বাজে যেন তোমারই মন্ত্র, আমি হয়ে যাই শুধু এক অনুগত বিশ্বস্ত যন্ত্র, আমাতে উঠল যে ধ্বনি, সর্বত্র বিস্তৃত হলো তার প্রতিধ্বনি, দিবস রজনী সূর্য চন্দ্র কোটি কোটি নক্ষত্ররাজি তোমারই আদেশে যেন ঐকতানে সুখাবেশে এ হৃদয়ে আজ ওঠে বাজি, আমার এ অবোধ পরাণ, মোহগ্রস্ত হয়ে যেন ছিল অতি ম্লান, তোমার ও নিঃস্বর সুর-সাগরে আজ স্নান ক'রে হলো মুক্ত, যে রহস্য এতদিন ধরে ছিল গুপ্ত, জানল সে তোমারি ও গীতে নিশ্চিত ইঙ্গিতে, তুমি আছ দয়াময় ধরণীর সবাকার হিতে, মরমী মানুষের চিতে, বোঝালে কী শান্তি থাকে ক্ষমা আর প্রীতে, গ্রহতারকার মতো অবিরত এ জগতে মূঢ়তার ক্রূরতার অন্ধকার বিদারিতে নিঃস্বার্থভাবে নিরন্তর আলো দিতে।

০০০

পুণ্য-পরশ-পুলক (২৪শ পর্ব)

শ্রীবসুমিত্র মজুমদার

সেবার ধানবাদে প্রথম পেলাম প্রাণকৃষ্ণদাকে (শ্রীমৎ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারীজী)। তাঁর মতো নিরীহ অমায়িক ভালোমানুষ সাধু আমি খুব কমই দেখেছি। তিনি যে একজন ব্রহ্মচারী, সংসারী মানুষদের কাছে শ্রদ্ধেয়জন এই অভিমান কিন্তু তাঁর মধ্যে দেখিনি। ধানবাদে তিনি কয়েকবার এসেছিলেন। কিন্তু সেই প্রথম বারের কথাটা বেশ মনে আছে। গুরুমহারাজের কাজের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণকৃষ্ণদাকে দেখাশোনা করার দায়িত্ব আমাদের ওপর পড়েছিল। কাজেই মহা উৎসাহে আমরা তাঁকে নিয়ে মেতে উঠলাম। তিনিও আমাদের মতো খুদে দেখভাল করনেওয়ালার পাল্লায় চুপচাপ পড়ে রইলেন। বলা ভাল, নিজেকে আমাদের হাতে ছেড়ে দিলেন। অন্যান্য ব্রহ্মচারী যাঁরা আসতেন, তাঁরা আমাদের ছোটদের বিশেষ খেয়াল করতেন না। তাঁদের গম্ভীর ব্যক্তিত্বের জন্যে আমরাও তাঁদের ধারে কাছে যেতাম না। বড়োদের সঙ্গেই তাঁদের অল্প সময়ের জন্যে কিছু দরকারী কথাবার্তা হতো। তারপর গুরুমহারাজকে প্রণাম করে যে যার চলে যেতেন।

মনে আছে, গুরুমহারাজ তখনও ঘর খোলেন নি, আমরা পাশের ঘরে প্রাণকৃষ্ণদাকে নিয়ে বসেছি। তিনি একটা চেয়ারে বসেছেন, আমরা তাঁর সামনে মেঝেতে বসে আছি। নিজেদের মধ্যে গজল্লা, হাসাহাসি করছি। তিনি নিজের মতো বসে আছেন। হঠাৎ খেয়াল হল এইরকম চুপচাপ বসিয়ে রাখাটা তো যথাযথ আপ্যায়ণের পর্যায়ে পড়ে না। তা ছাড়া আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে তাঁকে বিরক্ত যেন না করি। এখন চুপ করে সামনে বসিয়ে রেখে নিজেদের মধ্যে কথা বলা এটাও তো এক ধরণের বিরক্ত করা। ইংরিজিতে তাকে বলে 'বোর' করা। তাই তাঁকেও আমাদের সঙ্গে নিতে হবে, সঙ্গ দিতে হবে। তাঁর সঙ্গেও কথা বলতে হবে। সেইজন্যে আমাদের মধ্যে কেউ একজন বলে বসল, 'প্রাণকৃষ্ণদা, একটা গল্প বলুন।'

আসলে, কথা বলতে হবে তো! কিন্তু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কী ধরণের কথা কী ভাবে বলতে হয়, সে সময় সে সব জ্ঞান আমাদের ছিল না। সেটা সে জ্ঞানের বয়সও তখন নয়। আমরা সে সময় ছিলাম সিক্স, সেভেন, নাইন এই সব ক্লাসের। তা ছাড়া গুরুমহারাজের ভক্তজন, বিশেষ করে আশ্রমের কেউ হলে তো কথাই নেই। তাঁরা ছিলেন নিতান্তই আপনার জনের মতো।

প্রাণকৃষ্ণদা বললেন, 'গল্প! কী গল্প? তোমাদের রূপকথার রাজারাণীর গল্প তো আমার তেমন জানা নেই।'

—তা হলে অন্য কিছু বলুন। আপনি চুপ করে থাকবেন, আর আমরা নিজেদের মধ্যে গল্প করবো এটা তো ঠিক নয়

— না তোমরা গল্প করছ করো, আমি তো বেশ আছি। অসুবিধে হচ্ছে না।

ইতিমধ্যে আমাদের মধ্যে একজন বলে উঠল, 'এই শোন না, আমি শুনেছি, অবসর আর সুযোগ পেলে সন্ন্যাসীদের থেকে কিছু কথা জেনে নিতে হয়।'

ব্যাস, এরপর তাঁকে রকমারি প্রশ্ন করা শুরু হল। আমাদের মধ্যে কারও কারও দীক্ষা হয়ে গিয়েছিল। কাজেই আধ্যাত্মিক ব্যাপারে তখন নতুন অদম্য উৎসাহ। সেই নিরিখে প্রশ্ন করা শুরু হল। সেই প্রশ্নের ধরণের

কথা চিন্তা করলে এখনও না হেসে পারি না। আমাদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করল, 'আপনি গুরুমহারাজের কাছে কী করে দীক্ষা নিলেন? তাঁকে কি আগে থেকেই চিনতেন?'

প্রাণকৃষ্ণদা বললেন, 'আমি তো আশ্রমে গিয়েছিলাম বড় মহারাজজীর কাছে দীক্ষা নেবো বলে। কিন্তু তার আগেই তিনি দেহ রেখেছিলেন। তাই গুরুমহারাজের কাছে দীক্ষা নিলাম।'

—এ বাবা! মহারাজকে আপনার পছন্দ হয়েছিল?

প্রাণকৃষ্ণদা হেসে বলেছিলেন, 'গুরু পছন্দ অপছন্দের অতীত। তিনি মহাশক্তি। এ সব কথা তোমরা এখন বুঝতে পারবে না। বহুজন্মের সম্পর্ক।'

—কিন্তু আমরা তো গুরু বলতে মহারাজ ছাড়া কাউকে ভাবতেই পারি না।

—সে তো তোমরা তোমাদের বাড়িতে দেখেছ বলে। দেখেছ তিনি সকলের গুরুদেব। সেই ছবি তোমাদের মনে গেঁথে আছে। গুরুর কখনই শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠ ভেদ নেই। গুরু গুরুই।

আর একজন প্রশ্ন করলো, 'আচ্ছা দাদা! এই যে বলে শ্বাসে শ্বাসে জপ করতে হয়। তা হলে আমরা যখন পায়খানা করতে বসি তখন কী করব?'

—তখন কি তোমাদের শ্বাসকে তোমরা বিরাম দিচ্ছ?

—না।

—তা হলে জপেও বিরাম হবে না।

—ওটা অশুদ্ধ অবস্থা নয়?

—গুরুর দেওয়া নাম কখনও অশুদ্ধ হয় না। গুরুদেব বীজ দেন। তোমার কাজ সেই বীজমন্ত্রকে মনে মনে লালন করে জপ করে মহীরুহ করে তোলা।

পরের প্রশ্নটি উচ্চারণ করার আগেই মাসী প্রাণকৃষ্ণদাকে ডাকতে এলেন। 'একবার রান্না ঘরে আসুন, আপনার চাল ছেড়ে দেবেন।'

'হ্যাঁ চলো', বলে প্রাণকৃষ্ণদা উঠলেন।

আমাদের 'সৎপ্রসঙ্গ' হঠাৎ ভেঙে গেল। মাসীকে বললাম, 'ওখানে তো মা, যুথি মাসী, মাধুরী মাসী, আরতি মাসীরা আছেন। প্রাণকৃষ্ণদা ভাত রাঁধবেন কেন?'

সন্ন্যাসীরা সপাক আহার করেন। আমরা অন্য যা কিছু রেঁধে দিতে পারি, কিন্তু ভাত রাঁধতে পারি না। সেটা তাঁকেই চাপাতে হবে।

কিন্তু গুরুমহারাজ তো রাঁধতে আসেন না!

এরপর একরাশ বকুনি, 'সব কিছু গুরুমহারাজের সঙ্গে তুলনা করতে চাস! তোদের সাহস তো কম নয়! গুরুমহারাজকে দুপুরে ভাত খেতে কে কবে দেখেছিস্? খালি ডেঁপোমি!'

কিছুক্ষণ পরে চাল ছেড়ে দিয়ে প্রাণকৃষ্ণদা আবার এসে তাঁর আসনে বসলেন। কিন্তু মাসীর বকুনি শুনে আমাদের সৎপ্রসঙ্গের উৎসাহ ততক্ষণে উবে গেছে। তা ছাড়া দর্শন প্রণাম মানসে গুরুমহারাজের ভক্তশিষ্যদের আসাও শুরু হয়ে গেছে। আমরা তাই অন্যান্য নির্ধারিত কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলাম।

সেদিন কিন্তু জীবনের মতো দুটো সার কথা জেনে নিলাম, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীরা সপাক আহার করেন। আর যে কোনও অবস্থাতেই শ্বাসের যেমন বিরতি হয় না, তেমনি জপের, নামেরও বিরতি দিতে হয় না। পরবর্তীকালে

প্রাণকৃষ্ণদার লেখা একটা বই হাতে পেয়েছিলাম, 'শ্রীশ্রীমোহনানন্দের মর্ত্যলীলা'। আদ্যন্ত সে বই পড়েছিলাম। যদিও সে বই পড়ার বয়েস আর মেধা তখন ছিল না। প্রাণকৃষ্ণদা সম্বন্ধে সেদিনের যে ছবি আমাদের মনে গাঁথা হয়ে আছে, সেখানে তিনি অত্যন্ত সরল মানুষ। তাই তো আমাদের মতো ছোটোদের সঙ্গে তিনি যখন বসেছিলেন, তখন আমাদের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। সেই উত্তরের মধ্যেও তাঁর কোথাও আমাদের প্রতি তাচ্ছিল্যের বা উপেক্ষার ভাব ছিল না। এই ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের অন্যতম গুণ। নিজেকে কখনই আমাদের কাছে অধরা করে রাখেন নি। তাঁর এই নিরভিমানী ব্যক্তিত্বকে আজও শ্রদ্ধা না করে পারি না। অনেকদিন পরে অফিস থেকে ফেরার সময় হাওড়ার সাবওয়েতে প্রাণকৃষ্ণদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি 'আঠারো বাড়ি যাচ্ছিলেন। দুচার কথা বলে আমি ট্রেন ধরার জন্যে দৌড় লাগালাম। এখন আফশোষ হয়, 'আহা সেদিন যদি তাঁকে বাসে উঠিয়ে দিয়ে পরের ট্রেনেও তো ফিরতে পারতাম...।'

(ক্রমশঃ)

০০০

---

৬৫ পাতার পর

অবিশ্বাসী, নাস্তিক। বাড়িতে কোনো মূর্তিতো ছিলই না— বাইরের কোনো সার্বজনীন পুজোতেও যেতেন না তিনি। মন্দির, সমজিদ, চার্চ? নৈব নৈব চ। সংসারে এক লুকানো কালা পাহাড় যেন। হঠাৎ কী হল তাঁর? কিছুদিন ধরে দেখা যাচ্ছে মহারাজজীর কীর্তনে নিয়মিত যোগ দিচ্ছেন তিনি। চড়ুইভাতির দিন বলে কথা, আনন্দেতো সবাই ভাসছেন। তার মধ্যে যাঁরা একটু ওয়াকিবহাল তাঁদের মনে মাঝে মাঝেই উশখুশ করছে এক শঙ্কার কাঁটা। মাছের কাঁটা মাড়িতে বিঁধে গেলে যেমন বারবার জিভটা সেখানে চলে যায়, তেমনই চড়ুইভাতির জন্য বেছে নেওয়া জায়গাটার একটু বদনাম আছে। জায়গাটার নাকি একটা অদ্ভুত টান— যদি চড়ুইভাতির জন্য অথবা বেড়াতে যাঁরা এই স্থানে আসেন ফেরবার সময় শেষ পর্যন্ত দু'একজনকে ছেড়ে যেতেই হয় সেখানে। এসব কথা তাঁরা অন্য কাউকে বলেন নি—কী দরকার সাদা ঝরঝরে ভাতের মধ্যে কাঁকর গুঁজে দেবার। সমস্ত কুখ্যাতি ভুলে, সকল দ্বিধা পেছনে ঠেলে রেখে চলেছেন সবাই।

একসময় পথের রেখা ক্ষীণ হ'য়ে এলো। বন জঙ্গলকে যেন ভীষণ ঘন লাগছিল তখন। তার ভিতর দিয়ে যেন পথ কেটে চললো গাড়ি। জঙ্গলের আদিম অন্ধকারে জড়িয়ে আছে কেমন এক মায়া। বাঁশবনের ভিতরে বইছে হু হু বাতাসের কুহক বাঁশি।... জিপচালক সিং রাস্তা গুলিয়ে ফেললেন। গোলকধাঁধাঁ বনের মধ্যে অনেক পথের ফাঁদ। তার একটি ধরে সে চলে এলো সবার থেকে অনেক দূরে। ঘুরঘুটটি বনে দেখা যায় না কিছুই। একদিকে দুর্ভেদ্য গভীর অরণ্য অন্যদিকে অতল স্পর্শী খাদ।

যে দিকেই যাও মৃত্যুর অট্টহাসি। পথহীন রাস্তায় চলতে চলতে জিপটার যন্ত্র গেল বুঝিবা বিকল হয়ে। অতি কষ্টে সামাল দিয়ে দিয়ে চলতে চলতে সিং দেখে গাড়ির বাঁ দিকের দুটো চাকাই অনেকটা চলে এসেছে খাদের ধারে। ছোট্ট একটা ধাক্কা, গাড়ি চালানোর একটু এদিক ওদিক হলেই গাড়ি খসে পড়বে ধ্বংসের অতলে। বিপন্ন চিৎকারে সিং সবাইকে সাবধান ক'রে বললো ডানদিকে ঘেঁষে বসতে যাতে বাঁদিকে ভার না পড়ে। বাঁচাও বাঁচাও! পরিত্রাহি চিৎকার মহিলাদের। সিং-এর পাশে অবনীমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র অজয়। নীচু ঠাণ্ডা গলায় সিংকে নির্দেশ দিতে থাকলেন কীভাবে রাস্তার দিকে নিয়ে আসতে হবে জিপটাকে।....

ক্রমশঃ

অপ্রকটের দুই যুগ

শ্রীগুরুচরণাশ্রিতা কণিকা পাল

গুরুমহারাজকে ঘিরে আমাদের কতই না সুখ-স্মৃতি ছিল। পরিভ্রমণ আর কীর্তন-এই দুইটিই তারমধ্যে প্রধান। আমরা শিষ্য-শিষ্যারাও সেই ভাবেই নিজেদের জীবন পঞ্জিকা তৈরি করতাম, "মোহন বেণুর তালে তালে; জীবন নদী" ও আমাদের বয়ে চলত। এমনিভাবেই দিন চলছিল, আমাদের পরম ব্রহ্ম নারায়ণ ১৯৯৯ সালে ব্রহ্মলীন হলেন। আমরা তখন দিশাহারা, পাগলপারা, যা কোনও দিন স্বপ্নেও চিন্তা করতে পারিনি তাই-ই ঘটল আমাদের সঙ্গে। এখন উপায়? তাঁকে পাওয়ার পথ যে আমাদের খুঁজতে হবে। তিনি অবশ্য আমাদের মত সাধারণের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। "দিন যায় মোর ভাবি মনে বহু আছে... তুমিই জানালে মরণ দাঁড়ায়ে পাছে..."। "হরর্ণামৈব নামৈব নামৈব কেবলম্"।

আমরা অবশ্য বহু আগে থাকতেই প্রত্যেক মাসের শেষ রবিবার আমাদের অঞ্চলের এক একজন গুরু-ভাইবোনদের বাড়িতে শ্রদ্ধেয় অজিতদা (সোম) কে দিয়ে কীর্তন পরিচালনা করতাম। আর শ্রীগুরুদেব যেদিন ব্রহ্মলীন হলেন, সেইদিনও ছিল মাসের শেষ রবিবার, আমাদের কীর্তন ছিল। হঠাৎই আমেরিকা থেকে খবর আসল— তাঁর ব্রহ্মলীন হওয়ার একঘর ভক্তশিষ্য, সবাই স্তম্ভিত সে এক গুরুগম্ভীর ভাবের উদয় হল। আমাদের দক্ষিণ কোলকাতার প্রচুর ভক্তরা আমাদের বাড়িতে উপস্থিত হলেন— লোকে-লোকারণ্য। সবাই নিস্তব্ধ হয়ে বসে গুরুদেবকে স্মরণ করতে লাগলাম।

এদিকে গুরুদেবের শারীরিক অবস্থার অবনতি সম্বন্ধে আমরা সকলেই জানতাম, যে যার মত করে বিভিন্ন (source) থেকে খবর সংগ্রহ করতাম।

হঠাৎ একদিন আমাদের বোম্বের অর্চনাদি দীপ্তিদির সাথে আলোচনা করলেন আমাদের কিছু করণীয়তো আছেই, চুপচাপ বসে থাকাতো যায় না। আমি সর্বঘটেইতো আছি। স্থির হলো আমরা অষ্টম প্রহর নাম করব আর তারজন্য যে বড় হলের দরকার সেটার ব্যবস্থা অর্চনাদি তাঁর কাকীমা অর্থাৎ আমাদের ৺গোপাকাকীমাকে জানাতেই উনি ওনার দোতলার বিশাল হলঘরটি দিলেন। তাছাড়া আরও অনেক সাহায্য করলেন। ওনার লোকজনেরা সারারাত ধরে চা, জল সব পরিবেশন করলেন।

শুরু হল পথ চলা— শুরু হল নাম করা—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে; হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।"

উদ্যোগ আমরা নিলাম ঠিকই কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য নাম করার গায়ক-গায়িকাওতো চাই, আর গুরুমহারাজজীর উদ্দেশ্যে যা করা হবে তাতে আমরা কোনও ভাড়া করা দলও আনবোনা। যাইহোক 'নাম'তো শুরু হল, সত্যি কথা বলতে গেলে আজও 'গর্বে আমার বুক ভরে যায়, মহারাজ বলতে'। আশ্চর্য্য ব্যাপার, মা আনন্দময়ীর শিষ্য-শিষ্যারা, ঁরামঠাকুরের আশ্রমের, ঁশিবানন্দগিরি আশ্রমের সকলে এসে এমন নাম করলেন যে একজন আর একজনকে হারমোনিয়ামও ছাড়তে চাইছেন না। ও বলা

পরবর্তী অংশ ৭৬ পাতায়

খড়দহে রামকৃষ্ণ, নিত্যানন্দপ্রভু ও রাধাশ্যামসুন্দর

শ্রীমতী রাধা বসু (সংগৃহীত)

নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বংশধর যাদব কিশোর গোস্বামী দক্ষিনেশ্বর মন্দিরে ঠাকুর রামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রায়ই দেখা করতে যেতেন। একদিন তাঁর অভিপ্রায় ঠাকুরকে জানালেন, "যদি ঠাকুর একবার তাঁদের খড়দহে শ্যামসুন্দর দর্শনে আসেন তবে খুব ভাল হয়।"

এই প্রস্তাবে ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি প্রদান করলেন ও কবে আসবেন সেকথা জানতে উদগ্রীব হলেন। গোস্বামী জানালেন ঝুলনের সময় শ্রাবণ মাসে।

যাদব কিশোর দু'হাত তুলে নেচে উঠলেন। বললেন, আমাদের কুঞ্জবাটী এবার ধন্য হবে প্রভু।

ঠাকুর - কিসে করে যাব যাদব?

গোস্বামী- নৌকায় করে যাওয়া তো ভাল প্রভু। দক্ষিনেশ্বর ঘাট থেকে নৌকায় উঠবেন,

নামবেন খড়দহ ঘাটে। প্রভু, এবার আমি আসি?

ঠাকুর - ও হ্যাঁ, এসো, এসো, ঝুলনের সময় তোমাদেরবাড়ী যাব। শ্যামসুন্দর দেখব-শ্যামসুন্দর কে শ্যাম। ঠাকুর আনমনা হয়ে পড়লেন। যাদব কিশোর নড়তে পারছেন না, ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন। মাস্টার মশাই কখন যে চুপ করে এসে বসেছেন কেউ খেয়াল করেননি। মাস্টার মশাইয়ের প্রশ্ন শুনে ঠাকুর চমকে উঠলেন, ভক্তের লক্ষন কী?

ঠাকুর তাকালেন গোস্বামীর দিকে, মাস্টারকে লক্ষ করে বললেন, "শ্রীকৃষ্ণ কী বলেছেন শোনো-আমার বিগ্রহ ও আমার ভক্তকে দানি, অর্চন আর পরিচর্যা, স্তুতি ও গুণ-কর্মের অনু- কীর্ত্তন, আমার কথা শুনতে শ্রদ্ধা, আমাকে অনুধ্যান, আমাকে লব্ধ বস্তু সমর্পণ, দাস্যভাবে আত্ম- নিবেদন এবং আমার জন্ম-কর্ম কথন, আমার পুর্বালু মোদোন প্রভৃতি যে করেন তাঁর মোক্ষ লাভ হয়।"

গোস্বামী প্রশ্ন করলেন ঠাকুরকে-এই ভক্তি লাভ হবে কি করে?

ঠাকুর—একমাত্র সাধুসঙ্গ, আর—

গোস্বামী—আর কি?

ঠাকুর-ভগবদ্ বিরহ। একমাত্র ভগবদ বিরহ থেকেই ভক্তি লাভ হয়। সেজন্য মহাসৌভাগ্যবতী বলে ব্রজাঙ্গনাদের সম্বোধন করেছিলেন উদ্ভব। বলেছিলেন, বিরহে তোমরা শ্রীকৃষ্ণে সর্বাত্মভাবে অধিকৃত হয়েছো। এ বড়ো কঠিন ঠাঁই। ভক্ত আর ভগবান এক হয়ে যাওয়া। সাধুসঙ্গ তাই সোজা পথ।

সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার ১৪ই শ্রাবণ ১২৮১ (ইংরাজী ১৮৭৪ সালের জুলাই মাস)। সকাল বেলায় যাদব কিশোর গোস্বামী দক্ষিনেশ্বরে এসে হাজির। যাদব কিশোর পণ্ডিত মানুষ। সকলে ওঁনাকে পণ্ডিত যাদব কিশোর বিদ্যারত্ন নামে মানে। কিন্তু দক্ষিনেশ্বরে ঠাকুরের কাছে শুধুই যাদব কিশোর। ঠাকুর ওঁনাকে দেখে বললেন, পেয়াদা হাজির। এখনই যে যেতে হবে। তুমি দেখছো না, আমি কেমন ফুলবাবুটি সেজে বসে আছি।

যাদব কিশোর - আমরা এখন যাত্রা করতে পারি প্রভু?

ঠাকুর - নিশ্চই। তা যাব কি সে?

গোস্বামী - কেন নৌকায়?

ঠাকুর - হাসছেন, বললেন— এই ভরা শ্রাবণে, গঙ্গায় নৌকা করে! তা বেশ-তা বেশ।

গোস্বামী-নৌকায় কি আপনার অসুবিধা হবে?

ঠাকুর— না, না, আমার আবার কি অসুবিধা? নৌকায় বসব, হাওয়া খেতে খেতে পৌঁছে যাব। যদি ঝড়-বৃষ্টি হয় ?

গোস্বামী জোর দিয়ে বললেন হবে না, কারণ আপনি যে সঙ্গে আছেন।

ঠাকুর - ভালো, ভালো। চল যাওয়া যাক। যাদব কিশোরের হাত ধরে ঠাকুর নৌকায় উঠলেন এবং দুজনে উঠে বসতেই নৌকা ছেড়ে দিল। হাত তালি দিয়ে ঠাকুর গলা ছেড়ে গান গাইলেন,

"গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাজী কাঞ্চি কে বা চায়
কালী, কালী, কালী বলে অজপা যদি ফুরায়,
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।"

গান গাইতে গাইতে ঠাকুর অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। জোয়ারের জল বেড়েই চলেছে ওঁদের নৌকাও তীরবেগে ছুটে চলেছে আর ছুটে চলেছে ঠাকুরের মন। মানস চোখে কত কি দেখছেন। গোস্বামী মনে মনে ঠিক করেছিল, নৌকায় যেতে যেতে ঠাকুরকে খড়দহ গ্রামের উৎপত্তি, তাদের ভদ্রাসন, শ্যামসুন্দরের মন্দির সবিস্তারে জানাবেন কিন্তু সে সুযোগ তিনি পেলেন না কারণ প্রভুর মন হারিয়ে গেছে কোন অজানায়। তাঁর সামনে যিনি ভাবের ঘোরে বসে আছেন তিনি তো স্বয়ং, কেউ বলে 'পরমহংস' কেউ বলেন ঠাকুর। তিনি বলেন প্রভু। গোস্বামী ঠাকুরের মুখের দিকে দৃষ্টি রেখে হাতজোড় করে বসে আছেন ও মনে মনে ভাবছেন ঠাকুর তাকে বিদ্বান বলেন, পণ্ডিত বলেন কিন্তু গোস্বামী মনে মনে হাসেন ও লজ্জা পান যিনি বলছেন, তিনি তো বিদ্যার, পাণ্ডিত্যের শেষ কথা। এই সময় যাদব কিশোরের বয়স ৩৪-৩৫ বৎসর। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন, ঠাকুরের মুখে স্বর্গীয় দীপ্তি। ঠাকুরকে দর্শন, নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া এ-কী কম সৌভাগ্য! সেই বাড়ীর অতীত যেন ইতিহাসের রূপ ধরে ফুটে উঠেছে। অতীতেরও যে অতীত আছে তাকেই দেখছেন শ্রী রামকৃষ্ণ, যেহেতু ঐ বাড়ীতে দৈনিক লক্ষ হরিনাম হতো।

এবার চঞ্চল হয়ে উঠলেন যাদব-কিশোর। তিনি দেখতে পাচ্ছেন খড়দহের 'রাসখোলা ঘাট'। তখনকার দিনে এই 'রাসখোলা ঘাট'-ই ছিল পারাপারের ব্যবস্থা। হঠাৎ ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের খড়দহ তো এসে গেছে।

গোস্বামী— আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রভু। নৌকা এসে খড়দহের ঘাটে লাগল। ঠাকুরকে বরণ করে নেবার জন্য উপস্থিত ছিলেন গোঁসাই বাড়ীর সকলে। ঠাকুরের খেয়াল নেই, তিনি গুণ গুণ করে গাইছিলেন গোস্বামী ঠাকুরের কানে কানে আস্তে আস্তে বললেন প্রভু আমরা এসে গেছি। আপনাকে স্বাগত জানিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের পরিবারের সকলে ও গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও এসেছেন।

ঠাকুর তখন নেমে মন্দিরের দিকে হন হন করে এগোচ্ছেন— ঠাকুরের তো চেনার কথা নয়-ঠাকুর তো ছুটছেন না, তবু এত দ্রুত তাঁর গতি যে গোস্বামী ঠাকুরের সঙ্গে তাল দিতে পারছেন না। মন্দিরে এসে

পৌঁছালেন এগলি থেকে ওগলি হয়ে। তখন এসে দেখলেন মন্দিরের মধ্যে রূপোর তৈরী বেদীতে সিংহাসনে শ্যামসুন্দর বিরাজমান। পাশে অষ্টধাতুর তৈরী রাধার মূর্ত্তি। ঠাকুর নির্মলিত নেত্রে তাকিয়ে আছেন 'রাধা শ্যামসুন্দরের দিকে, দু'চোখে অশ্রুধারা। সেই অবস্থায় গেয়ে উঠলেন,

"শ্যামের নাগাল পেলেম না লো সই
আমি কী সুখে ঘরে রই।
শ্যাম যদি মোর হত মাথার চুল
যতন করে বাঁধতাম বেণী, সই, দিয়ে বকুল ফুল
শ্যাম যখন বাজায় বাঁশী
আমি তখন জল নিতে যমুনাতে আসি
(আমি) বনপোড়া হরিণীর মতো
ইতি-উতি চেয়ে রই।।"

সেই মুহূর্তে মন্দিরে সৃষ্টি হচ্ছে নব-ইতিহাস। গ্রামের মানুষের কাছে এ এক অভিনব ব্যাপার। তাঁরা দুই শ্যামকে দেখছেন একসঙ্গে। এক শ্যাম মন্দিরের বিগ্রহ, দ্বিতীয় শ্যাম প্রেমের ভাবে বিভোর রামকৃষ্ণ। দুজনে মিলে মিশে এক হোয়ে গেছেন। ঠাকুর নেচে উঠলেন। ওঁনার শ্যামসুন্দরকে ছেড়ে আসতে পারছেন না। তখন যাদব কিশোর বললেন প্রভু চলুন-এবার আমাদের বাসভবনে। চলেছেন রামকৃষ্ণ -পা যেন চলে না। ফিরে ফিরে তাকান শ্যামসুন্দরের মন্দিরের দিকে। গলি দিয়ে এসে বাঁ-দিকে ঘুরলেন রামকৃষ্ণ। কোথায় গোস্বামী তাঁকে নিয়ে যাবেন, তা না, ঠাকুরই নিয়ে চলেছেন। তারপর আসেন রাসমঞ্চে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কিন্তু বিগ্রহ নেই পা যেন চলে না। তবু সিঁড়ি দিয়ে উঠলেন ও মানসচক্ষে দেখলেন, দোলায় দুলছেন রাধাকৃষ্ণ। সামনেই গঙ্গা। মা গঙ্গা কুলুকুলু ধ্বনিতে এগিয়ে চলেছেন। ঠাকুর সেদিকে তাকিয়ে 'জয় মা, জয় মা' বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে যাদব কিশোরের সঙ্গে নেমে এলেন।

যাদব—প্রভু এবার আমাদের 'বাসভবনে' পায়ের ধুলো দেবেন চলুন। ঠাকুর গোস্বামীর সঙ্গে 'বালাখানা ' পৈতৃক ভিটাতে এলেন রাসখোলাতে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলা ঘরে ঠাকুর বসলেন বড়ো ঘরে। একজন হাত পাখা দিয়ে বাতাস করছেন। যাদব কিশোর হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। বললেন, প্রভু প্রসাদ গ্রহণের সময় হয়ে গেছে। সেদিন ছিল গোস্বামীর শ্যামসুন্দরের সেবা। তাড়াতাড়ি প্রসাদ এসে গেল। নানাপদ, ফলমূল, মিষ্টি এল 'অন্নভোগ'।

ঠাকুর বললেন, রাধাশ্যামের প্রসাদ অমৃত সমান। অন্নভোগ গ্রহন, বিশ্রাম তারপর দক্ষিনেশ্বরে প্রত্যাবর্তন। দক্ষিনেশ্বরে ফিরে এসে মন আনন্দরসে ভরপুর। প্রভু নিত্যানন্দের ভদ্রাসন, শ্যামসুন্দর মন্দির, বালাখানাবাড়ী (বৈঠক খানা) পাশেই 'রাসমঞ্চ' দেখে ঠাকুর খুব পরিতৃপ্ত। মাস্টার মশাই এসে বসলেন ও জিজ্ঞাসা করলেন, দেখলেন শ্যামসুন্দর?

ঠাকুর - শুধু শ্যামসুন্দর নয়, আরও অনেক কিছুই তিনি আমার চোখ দুটি দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

মাস্টার মশাই - যাদব কিশোরকে কেমন লাগল প্রভু?

ঠাকুর - ভালোই, ও বড়ো পণ্ডিত, যে ভোগ একশো টাকা দিলে পাওয়া যায়না, সেই ভোগ আমায় খাওয়ালো। ওকে দেখতে দেখতে উদ্দীপন হয়।

এত খাওয়াল—

ও যে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বংশধর।

মাস্টার মশাই - ওঁকে একটু নেড়ে চেড়ে দিন না।

ঠাকুর চমকে ওঠেন, বলেন ওদের অন্য কাজ, ওদের গার্হস্থ্যের মধ্য দিয়ে হরিনাম—

বিলোতে হবে। ওরা যে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বংশধর। আমি কি সেখান থেকে টেনে আনতে পারি। ওরা বেশ আছে, ভালো আছে তাই থাক।

গান গেয়ে উঠলেন ঠাকুর,

"আপনাতে আপনি থেকো
মন যেও নাকো কারো ঘরে"

মায়ের মন্দির থেকে ভেসে এল কাঁসর ঘন্টা ধ্বনি। সন্ধ্যারতি শুরু হল -

"মা ভবতারিনীকে দু'হাত জোড় করে ঠাকুর প্রনাম জানালেন।"

শ্রী'ম রচিত শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ 'কথামৃত' অনুসরণে যাদব কিশোর গোস্বামীর (পৌত্রী) শ্রীমতী পম্পা চট্টোপাধ্যায় (বালাখানড়বাড়ী) পৈতৃক বাড়ী।

সংগৃহীত

---

৭২ পাতার পর

হয়নি শ্রীশ্রী ওঁঙ্কারনাথজীর ভক্ত শিষ্যরাও এসেছিলেন— আমাদের ৺ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় পরপর দুদিন এসেছিলেন সে যেন সর্বধর্মসমন্বয় আর চব্বিশঘণ্টায় নামের আমাদের গুরুভাই বোনেদেরও কেউ বাকী ছিলেন না যোগ দিতে। তারপর আমরা ঠিক করলাম গুরুমহারাজজীর আরোগ্য কামনায় আমরা যেটা শুরু করলাম উনি সুস্থতা লাভ করলে, পরের বছর তার উদ্‌যাপন করব। যাইহোক তা' আর হল কৈ? গুরুদেবতো প্রকটলীলা সাঙ্গ করলেন।

যেহেতু সেটা ছিল ২৯শে আগস্ট তাই আমরা একবছর ধরে প্রত্যেকটা মাসের ২৯ তারিখে যে যে গুরুভাইবোনেরা চেয়েছেন, তাঁদের সবার বাড়িতে শ্রদ্ধেয় অজিতদাকে নিয়ে গিয়ে কীর্তন করেছি।

একবছর পূর্তি হলে আমরা আমাদের বাড়িতে অষ্টমপ্রহর নামসংকীর্তনের আয়োজন করি। আর সেটা তিথি ধরে, তৃতীয়া তিথি পড়া থেকে ছাড়া পর্যন্ত। সেইসময় মা আনন্দময়ীর শিষ্যা ৺ভবানী মাসীমা আর ওনাদের প্রচুর ভক্ত শিষ্যগণ, স্মৃতিকনাদির মেয়ে শুভ্রাদি এদিকে মহামিলন মঠের কিঙ্কর শামানন্দজীও এসে প্রবচন করেছেন। দৈবৎ সঙ্ঘের সবাই, দেবগীতালি সঙ্ঘের বাণীদিতো রাত্রিবাস করেছেন। কলকাতার সকল গুরু ভাই ভগ্নীরা। তবে ৺বিভূতি সেনগুপ্তদাও আমাদের অনেক ভাবেই সাহায্য করেছেন। সল্টলেক থেকে কল্পনাদিই প্রথম আসেন এবং ঐ অঞ্চলের সবাইকে এনে যোগদান করান। নাইরোবির ৺মঞ্জু মিত্র আর কুঞ্জভঙ্গ করতেন কখনও খড়্গপুরের বাদলদা অথবা ৺ছবিদি। ৺ছবিদির কথা বলতে গেলে আজও আমার চোখে জল আসে। যতদিন সামর্থ্য ছিলো প্রতিবছর এসেছেন।

বাড়িতে যেন মহোৎসব হচ্ছে, সিঙ্গাপুরের শম্ভুদা বই নিয়ে, মানু ছবি লকেট নিয়ে বসে গেছে।

ক্রমশঃ

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

নিম্নে যে লেখাটি দেওয়া হচ্ছে, সেটি আঠারো বাড়ির ঔমা বসু এখন থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগে ওনার নিজ বাসভবন থেকে আমাকে আর শ্রদ্ধেয়া দীপ্তি ব্যানার্জীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। "তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি..."র মত ঘটনা— আজ যেটি দীপ্তিদির কাছ থেকে আমার হস্তাগত হয়েছে এবং তাই আমি আমাদের পাঠক পাঠিকাদের জন্য সেই হুবহু লেখাটি পড়বার জন্য লিপি বদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছি।

৪ঠা জানুয়ারী শ্রীশ্রীমহারাজের শুভ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৫ই বিকালে তিনি আঠারো বাড়িতে সৎসঙ্গ করেন। প্রশ্ন ছিল— ভগবানের সেবা আমরা কেমন করে করবো? তাঁর সেবার যথার্থ এবং ক্রম কী? শ্রীশ্রীমহারাজ সেবার যথার্থ স্বরূপ কি তাহা বুঝিয়ে বলবার সময় দু-ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা ব্যাপী তাঁর অনির্বচনীয় ভাব সমাধি দর্শন করেন।

পূর্বদিবস সৎসঙ্গে তিনি একঘণ্টা দেড় ঘণ্টা ধরে তাঁর অমৃতময় বাণীতে ভগবানের সেবার স্বরূপ সম্বন্ধে কত কথা কত লোক কত মোহন পদাবলী উদ্ধৃত করে যা বোঝান তার থেকে বুঝতে পারছিলাম— তাঁর সমস্ত মন্ত্র রাধাভাবে ভাবিত হয়ে রয়েছে— কিন্তু আনন্দের লহরী ছিল হাস্যময়। সেই অপরূপ রূপরাশির গান গাইতে লাগলনে, 'কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমারই রসাল নন্দনে। কবে তাপিত এ চিত শীতল করিব তোমারি করুণা চন্দনে। প্রায় আড়াই ঘণ্টার উপর তাঁর এই ভাবাবস্থা'। অজিতরা এবার কীর্তন শেষের গান আরম্ভ করেছে— 'জয় রাধে রাধে গোবিন্দ বল'। মহারাজের সামনে হরির লুঠের বাতাসা ধরা হল। হঠাৎ তার থেকে একটি বাতাসা তুলে নিয়ে মহারাজ মুখে দিলেন। সমবেত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অমর শ্লোকটি উদ্ধৃত করে বললেন "দর্পনাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী, আস্বাদিত হয় লোভ আস্বাদিতে নারি। বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়, রাধিকা-স্বরূপ হইতে তবে মন ধায়"। শ্লোকটি বলেন আর মধুর মোহন হাসির ছটায় তাঁর সমস্ত শ্রীমুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে থাকে। একটু বিস্মিত হয়েই ভাবি মহারাজ শ্রীচরিতামৃতের শ্লোক আস্বাদন করছেন আর হাসছেন— এতো বড়ো অদ্ভুত। তিনি তো চৈতন্য ভাগবতের দুচার লাইন পড়তে না পড়তে অশ্রুপ্লুত হয়ে ওঠেন। কিন্তু আজ এমন কেন? তখন কে জানত যে আজিকার এই হাস্যের আড়ালে অসীম রোদন সমুদ্র স্তম্ভিত হয়ে আছে। সেটা আমরা বুঝতে পারলাম ৬ই জানুয়ারী দিনের কীর্তনে বেলা ১টা থেকে প্রায় তিনটে পনেরো পর্য্যন্ত তা ভাব সমাধির চেয়ে অনেক বেশি। কত বছর আগে একদা শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে নির্জন মৃদু দীপালোকিত গম্ভীরার প্রোকষ্ঠে অতি অন্তরঙ্গ দু-একজন ভক্তের কাছে যে চিত্রের প্রকাশ সেই দিকে অনিমেষে চেয়ে আমরা ভাবছিলাম শ্রীমদ্‌ভগবতের সেই শ্লোকটি, "মন্দং জহাস বৈকুণ্ঠে মোহয়ন্নিব মায়য়া।"— সেই বৈকুণ্ঠনাথের মৃদু স্মিত হাস্যোদ্ভাসিত শ্রীমুখের ধ্যান আমাদের চিরায়মান হোক। ওমা! তখন কেইবা জানতো রোদনের সাগরে এই হাসি কোথায় ভেসে যাবে। তবে যেদিন সৎসঙ্গে মহারাজ

যা যা বলেছিলেন স্মৃতির ধ্যান তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন তারই চরম উপসংহার দেখালেন তাঁর ভাব সমাধিতে অগণিত উদ্বেলিত জনসমুদ্রের মাঝে। কর্মব্যস্ত মহানগরীয় বুকে দিনের প্রখর আলোয় নেমে এলো গম্ভীরার রজনী। আপনি আস্বাদন করে তিনি দেখালেন কেমন করে ভগবানের সেবা করতে হয়। অশ্রুসাগরে নিজেকে বিসর্জন করে তাঁরই সত্তার সঙ্গে একীভূত হয়ে সেবার স্বরূপ যে কী তাই বোঝালেন আমাদের!

৬ই জানুয়ারী বেলা প্রায় বারোটা আঠারো বাড়ির সুসজ্জিত উৎসব মঞ্চে চন্দ্রাতপতলে শত শত নরনারী অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করছে কখন কীর্তনের আসরে শ্রীশ্রীমহারাজ নেমে আসবেন। কীর্তন আরম্ভ হয়ে গেছে এমন সময় তিনি নেমে এলেন। আসনে বসে একতারা কাগজ নিয়ে কলম দিয়ে চিহ্নিত করছেন। বোধহয় আশ্রমে গিয়ে দান করবেন তারই নামের তালিকা। কীর্তনসভায় গান হচ্ছে। তিনি প্রয়োজনীয় কর্ম্মের তালিকায় কলম দিয়ে চিহ্ন দিয়ে যাচ্ছেন।

দুচারটি সাধারণ গান হোল। ইতিমধ্যে তাঁর কাজ সাধ্য হয়েছে। তিনি শ্রীহস্তে করতাল তুলে নিলেন। শ্রদ্ধেয় ডাক্তার বিজনবাবু তখন শ্রীগৌরাঙ্গের নদীয়া চিরতরে ত্যাগের একটি বিরহভারাক্রান্ত পদ আরম্ভ করলেন। নদীয়ানগর এ জীবনের মত ভক্তদের অশ্রুসাগরে ডালি দিয়ে চলে যাচ্ছেন। বাসুদেবের হিয়া বিদীর্ণ হতেছে, দাস নরহরি বিকল পরাণে চেয়ে আছেন; 'কহ সখি জীবন উপায়? ছাড়ি গেল গোরা নটরায়। ভাবি ভাবি তনু ভেল ক্ষীণ, বিচ্ছেদে বাঁচিব কতদিন? হিয়া বার বার অনুরাগে, এ দুঃখ কহিব কার আগে? কহ বাসু ঘোষ নিদান, গোরা বিনু নারাজে পরাণ।' বিরহলীন করুণ সুরে সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীমহারাজের নয়ন নিমীলিত ও শ্রীকরের মন্দিরা ভাবময় অনুরণণে মন্দ্রিত হয়ে উঠছে। এই সময় হতেই তাঁর ভাবান্তর বুঝতে পারা গেল।

ডাঃ বিজনবাবুর কীর্তন শেষ হতেই শ্রীশ্রীমহারাজ অস্ফুট মৃদুকণ্ঠে গান ধরলেন; "আমার প্রাণ যা চাহেনা, তুমি এসে তাহা' অন্তরে জাগায়ে দিয়েছ। আমারচরণ চলেনা হাত ধরে তবু তুমি মোরে নিয়ে চলেছ—"

জনতা হরি হরি ধ্বনি করে উঠলো। কিছুতেই মনকে নীচে নামাতে পারছেন না কতই না চেষ্টা করছেন। 'পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম পর সঙ্গে পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার, নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার, মনে পড়ে গেল চৈতন্যের এমনই বৈরাগ্য ছিল যে জিহ্বায় চিনি দিলেও তা ফরফর করে উড়ে যেত— যে রসে জীবন পাত্র উচ্ছল সেথায় চিনির রসের স্থান কোথায়? আজও কৃষ্ণ রস কিছু ফিকে করতে, মনকে অতিকষ্টে কথঞ্চিৎ বাহ্যভূমিতে নামাতে মহারাজকে একটি চিনির বাতাসা জিহ্বায় দিতে হল। হরির লুঠের কয়েকটি বাতাসা তিনি স্বহস্তে ছুঁড়লেন, তারপর পরমানন্দ, প্রণবানন্দ এঁরা হরির লুট দিলেন। রাধে রাধে ধ্বনির মাঝখানে ভক্তেরা শ্রীশ্রীমহারাজকে ঘিরে নিয়ে ত্রিতলে তাঁহার কক্ষে পৌঁছে দিয়ে এলেন। আজ পৌনে একটা থেকে তিনটে পনেরো মিনিট পর্য্যন্ত যে অবস্থার মধ্যে ছিলেন গানটি গাইতে আরম্ভ করেই তাঁর বিলক্ষণ ভাবান্তর এসে উপস্থিত হল। ক্রমশঃ

যদি লেখাটিতে কোনও নাম সংক্রান্ত ত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে সম্পাদিকার ঐ হাতের লেখাটি থেকে আপ্রাণ সঠিকটি উদ্ধারের চেষ্টার পরেও ত্রুটি বলে মার্জনা করে দেবেন।

বি.দ্র. সেইবছর ঐ জানুয়ারীতেই ওনার জন্মতিথি পালিত হয়েছিল। যার উল্লেখ শ্রদ্ধেয় অজিত সোমের বইতেও পাওয়া যায়।

শরণম শরণম গুরুচরণম

শ্রীমতী রীণা মুখোপাধ্যায়

আসন্ন শারদীয়া উপলক্ষ্যে শ্রী শ্রী গুরুদেবের চরণে অন্তরের প্রণাম জানাই। গুরুদেব চলে গেছেন, বলা টা বোধহয় ভুল হবে, তিনি আমাদের মধ্যেই বিরাজমান। সদা সর্বদাই আমাদের জীবনের প্রতিদিনের জটিলতা কুটিলতা সমস্যা থেকে রক্ষা করে চলেছেন। কিন্তু আমরা কী করলাম কেন করলাম? সারাজীবন জন্ম জন্মান্তর শুধু হাত পেতে সংসারের জন্য নিজের জন্য চেয়ে যাব। আমাদের চাহিদার শেষ নেই। গুরুদেব দুটি হাত ভরে আমাদেরকে বিলিয়ে দিয়েছেন সর্ব কালের সর্বস্ব। তাঁর আশীর্বাদ আমাদের শিরোপরে সর্বদাই বর্ষিত হয়ে চলেছে। কিন্তু আমাদের গ্রহণ ক্ষমতা সকলের সমান নয়। তাই তো বলি, গুরুদেব ওকে দিচ্ছেন, ভালোবাসেন। আমাকে ভালোবাসেন না তাই কিছু দেন না। আধার উচ্চ মার্গের হলে গুরুদেবের দেখানো পথে সহজেই চলতে পারা যায়। সকল বাধা বিপত্তি উনি কাটিয়ে দেন, পথ সহজ করার জন্য। শিষ্যকে হাতটি ধরে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে চলেন। কিন্তু আমরা সেসব বুঝতে চাই না। আমরা আমাদের প্রাপ্য জাগতিক সুখ দুঃখ বিষয় আসয়ের জন্য ওনার সঙ্গে ছুটতে থাকি। ওনার অন্তিম সময় আমরাই ডেকে এনেছি। তার জন্য আমরাই দায়ী। গুরু শিষ্যের সম্পর্ক জন্ম জন্মান্তর। এই বন্ধন কোনো যুগেই ছিন্ন হবার নয়। মনে পড়ে মহাভারতের দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ সভার কথা? সেখানে উচিত কথা না বলার ফল স্বরূপ কেউ ই শ্রী কৃষ্ণের ন্যায়বিচার থেকে রেহাই পান নি।

এখন আসি শ্রীশ্রীগুরুদেবের মুখ নিঃসৃত বানী ও আলোচনা। (১) তাঁর সঙ্গে সাধনার দ্বারা ক্রমেই একাত্মতা লাভ করতে পারলে তখন আর বিচ্ছেদ বা বিক্ষেপ কিছুই থাকবে না।" (২) "ভক্তি,জ্ঞান, যোগ এবং কর্ম চারটি পথেই তাঁর কাছে পৌঁছোনো যায়।" (৩) "তীর্থ অন্তরে,সর্বদা পবিত্র ভাব, পবিত্র ভাবনা নিয়ে বাস করতে পারলে,যেখানে ই থাকো তীর্থ।" আমরা যতই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকি, ভোগ প্রসাদে পরিতৃপ্ত হই, দান ধ্যান করিনা কেন,নাম সংকীর্তন করিনা কেন—

এইসব কিছুই বহির্জগতের আবেদন নিবেদন। আর সবাই ভাবে দেখ ওরা কত পুণ্যবান। আমরা গুরুদেবের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়েই জীবন কাটালাম। এই আক্ষেপ থেকে সর্বদাই তারা গুরুদেবের স্মরণ করে যাচ্ছে। এই দীন হীন ভাবনার মধ্যেই অন্তরে একটু একটু করে পুণ্য সঞ্চয় হচ্ছে নিজেদের অজান্তে। অপরদিকে যাদের সর্বদা গুরু সঙ্গ সহজ লভ্য হচ্ছে তাদের অন্তরে অহংবোধ জমা হচ্ছে। বড়োমহারাজজীর নির্দেশে গুরুদেবের রাজবেশ ধারণ। এখানে কে তাঁকে কত অলঙ্কার ভাণ্ডারার জন্য অর্থ দান করল সেসব ভগবৎ চিন্তার সর্বোচ্চ শিখরে প্রবেশ করতে পারেনা। এসবের মধ্যে দিয়ে আমাদের কর্ম ফল খণ্ডন হয়।

ভগবানের চরণে পৌঁছতে গুরুদেব চারটি পথ বলে দিয়েছেন। গীতা তে ও এই পথের কথা বলা আছে। প্রশ্ন জাগে, ভগবানকে ডাকাডাকি করলেই কী ভক্ত হওয়া যায়? নিজেরা যখন ভাবনা চিন্তা

করেও কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারি না, তখনই গুরুরূপী ভগবানের খোঁজ মনে করি, ইষ্টদেবকে ডাকাডাকি করি। যদি বাসনা কামনা পূরণ হয়, তাহলে নিজেদের ভাগ্যবান বলে ভাবি। গুরুদেবের কাছে ছুটে যাই, ঘটা করে পুজো করি, আনন্দ অনুষ্ঠান করি। এর অন্যথা হলে ভগবানে হারিয়ে কুচিন্তা মনে জট পাকায়। আমার ঠাকুমা ঋষি বঙ্কিম ভবনের কন্যা। বঙ্কিম ভবনের গৃহদেবতা শ্রী শ্রী রাধাবল্লভ জীউ। ভাগলপুরে ঠাকুমার মেজো ভগ্নিপতি ছিলেন কলেজের প্রিন্সিপাল। ওখানে গুরুদেবকে স্বামীজী বলে সবাই চিনত। ওনারাই গুরুদেবকে সেই প্রথম রাধাবল্লভের মন্দিরে নিয়ে আসেন। গুরুদেব রাধাবল্লভের পুজো অর্চনা করেন। সেই প্রথম সবাই গুরুদেবকে দর্শন ও প্রণাম করেন। আমার ঠাকুমা সেই থেকে বিপদে পড়লে মহারাজজী মহারাজজী করতেন। জন্ম থেকেই ঠাকুমার মুখে মহারাজ আর মহারাজ নাম শুনতাম। মহারাজ কলকাতায় এলেই ঠাকুমা সবাই কে নিয়ে যেতেন। ঠাকুমা সবাই কে চিনতেন। এমনকি আমাদের ছোট ছোট ভাই বোনদের কেও নিয়ে যেতেন। মহারাজের শ্রী মুখ নিঃসৃত কীর্তন শুনে শুনে ঠাকুমার সব মুখস্থ হয়ে যেত। বাড়ীতে ঘরের কাজ করতে করতে মহারাজের গান গাইতেন—এমনই মোহিত হয়ে শুনতেন। কুলগুরুর কাছে দীক্ষা হয়েছিল ঠাকুমার অনেক আগে। কিন্তু ঠাকুমার প্রগাঢ়ভাবে মহারাজের চরণে আর পিতৃভবনের রাধাবল্লভের চরণে অন্তরের ভক্তি ছিল। ঠাকুমার মুখে ছিল অবিরাম মহারাজ আর রাধাবল্লভের নাম গান।

ঠামার (ঠাকুমা) কাছে থেকেই মহারাজের দর্শন প্রণাম হয়েছে বারবার। আমাদের পরিবারের প্রায় সবাই মহারাজের চরণে দীক্ষাগ্রহণ করেছি। এরপর জ্ঞান আর যোগ। এগুলো খুবই কঠিন। রামকৃষ্ণ দেব বলেছেন, ঘরে বসে বই পড়ছি, ভেতরে কোনো জ্ঞান নেই। এতে কোনো লাভ নেই। যোগ তো আরো কঠিন। কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ই গুরুদেবের চরণে পৌঁছনো যায়। সৎ কর্ম করলে পরোপকার হয়, পরিবার সমাজের কল্যাণ হয়। সমাজ এগিয়ে চলে দেশের উন্নতি হয়। আমি অনেক ভালো কর্ম করছি কিন্তু আমার ভালো হচ্ছে না কেন?? এই ভাবনা ভাবলে হবে না। ফলাফল ভার গুরু ইষ্ট চরণে অর্পণ করে নিষ্কাম কর্ম করতে হবে। জপতপ ও শুদ্ধ মনে করতে হবে।

গুরুদেব বলছেন, তীর্থ অন্তরে। এই সব নিষ্কাম কর্ম করতে করতে আমদের অজান্তে ই মন পবিত্র হয়ে যায়। মনে আমাদের পাশবিক প্রবৃত্তির জোর অনেক অনেক বেশি। তাই আমরা মনকে বশে আনতে পারি না। শ্রী গুরুদেবের আশীর্বাদের মধ্যেই আমরা সৎ কর্মে সচেষ্ট হই। ধীরে ধীরে অহংবোধ কমতে কমতে মন শুদ্ধ হয়ে তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। সেই শুদ্ধ পবিত্র অন্তরে গুরু ইষ্টের অধিষ্ঠান। তখন অন্তরে গুরু ইষ্টকে সর্বদাই অনুভূত হবে। আর তীর্থে তীর্থে না ঘুরে বেড়ালেও চলবে। গুরুদেবের চরণে সব তীর্থ, সকল দেব দেবীর অধিষ্ঠান। গুরুদেব স্বয়ং স্বয়ং নারায়ণ। গুরুদেবের বাক্য মেনে চললে স্বয়ং ইষ্ট দর্শন হয়।

হে গুরুদেব— তুমি আমায় ভক্তি দিলে, তাই আমি ভক্তিমান, তুমি আমায় শক্তি দিলে, তাই আমি শক্তিমান। তুমি আমায় অর্থ দিলে, তাই আমি বিত্তবান, যে প্রেম দিলে মোরে, তারে করি সম্মান। জয় শ্রী শ্রী গুরুদেবের চরণে অন্তরের জন্ম জন্মান্তরের প্রণাম জানাই।

জয় শ্রী শ্রী গুরুমহারজজীকী জয়।

শ্রীশ্রী গুরুমহারাজজীর শ্রীচরণাশ্রিত শ্রী শঙ্কর ভৌমিক ও শ্রীমতী রুণা ভৌমিকের সৌজন্যে

দেওঘর ও অন্যান্য আশ্রম সমূহের উৎসবের অনুষ্ঠান সূচী

২০২৬ সাল	১৪৩৩ সন	উপলক্ষ্য
১১ই অক্টোবর ১৫ অক্টোবর	২৩শে আশ্বিন, রবিবার ২৭শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার	দেওঘর আশ্রমে শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর প্রতিপদাদি কল্পারম্ভ ঘটস্থাপন ও নবরাত্রি ব্রতারম্ভ।
১৬ই অক্টোবর	২৮শে আশ্বিন, শুক্রবার	মহাষষ্ঠী, শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর ষষ্ঠীবিহিত পূজা প্রশস্তা। সায়ংকালে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস।
১৭ই অক্টোবর	২৯শে আশ্বিন, শনিবার	শ্রীশ্রীদুর্গা মহাসপ্তমী। পূর্বাহ্ন ৯।২৮ মধ্যে দ্ব্যাত্মক চর লগ্নে ও চরণবংশে (কিন্তু কালবেলানুরোধে দিবা ৭।৪ গতে পূর্বাহ্ন মধ্যে শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর নবপত্রিকা প্রবেশ, স্থাপন ও সপ্তমীবিহিত পূজা প্রশস্তা।
১৮ই অক্টোবর	৩০শে আশ্বিন, রবিবার	প্রাতঃ ৫।৫৩ মধ্যে শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর শুক্লাসপ্তমী বিহিত অধিক পূজা প্রশস্তা।
১৯ অক্টোবর	১লা কার্তিক, সোমবার	শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর মহাষ্টমী বিহিত পূজা প্রশস্তা। সন্ধিপূজা : ঘ: ৭।২৫।১৫ গতে সন্ধিপূজারম্ভ। ঘ: ৭।৪৯।১৫। গতে বলিদান। ঘ: ৮।১৩।১৫ সেঃ মধ্যে সন্ধিপূজা সমাপন।
২০শে অক্টোবর	**২রা কার্তিক, মঙ্গলবার**	**ঘ ৫।৩৮।৩৫ সে:** গতে শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর মহানবমী বিহিত **পূজাপ্রশস্তা। সপ্তসতী**র (চণ্ডী) হোম ও পূর্ণাহুতি এবং নবরাত্রি ব্রত **সমাপন।**
২১শে অক্টোবর	৩রা কার্তিক, বুধবার	দশমী। শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর **দশমী বিহিত পূজা সমাপনান্তে** বিসর্জন প্রশস্তা। বিসর্জনান্তে অপরাজিতা পূজা। বিজয়াদশমী কৃত্য। দুর্গাপুর আশ্রমেও এই পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। *বি.দ্র. গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকামতে।*
২৫শে অক্টোবর	৭ই কার্তিক, রবিবার	শ্রীশ্রী কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা ও শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ পূজা দেওঘর আশ্রমে ও পুরী আশ্রমে অনুষ্ঠিত হইবে।
৮ই নভেম্বর	২১শে কার্তিক, রবিবার	দেওঘর আশ্রমে শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা মহোৎসব ও ভাণ্ডারা।
১০ই নভেম্বর	২৩শে কার্তিক, মঙ্গলবার	দেওঘর আশ্রমে অন্নকূট মহোৎসব ও ভাণ্ডারা।
১৮ই নভেম্বর	১লা অগ্রহায়ণ, বুধবার	দেওঘর আশ্রমে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা ও ভাণ্ডারা। জামসেদপুরের শ্রীশ্রীবালানন্দ তীর্থাশ্রমেও শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা অনুষ্ঠিত হয়।
১৯শে ডিসেম্বর	৩রা পৌষ, শনিবার	দেওঘর আশ্রমে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর ১২৩তম শুভাবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, অভিষেক, ভাণ্ডারা ও দরিদ্র নারায়ণ সেবা, সাধুভাণ্ডারা ও কম্বলদান, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের শীতবস্ত্র বিতরণ। অন্যসকল আশ্রমেও জন্মতিথি উৎসব পালিত হইবে।

দেওঘর ও অন্যান্য আশ্রম সমূহের উৎসবের অনুষ্ঠান সূচী

২০২৭ সাল	১৪৩৩ সন	উপলক্ষ্য
১লা জানুয়ারী	১৬ই পৌষ, শুক্রবার	ইংরাজী নববর্ষ উৎসব উপলক্ষ্যে কলিকাতাস্থিত শ্রীশ্রীমোহনানন্দ আশ্রমে (সল্ট লেক অফিস) শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর বিশেষ পূজা, অভিষেক, ও প্রসাদ বিতরণ।
১১ই ফেব্রুয়ারী	২৭শে মাঘ, বৃহস্পতিবার	দেওঘর আশ্রমে শুভ বসন্তপঞ্চমী তিথিতে ৺শ্রীবালা ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীমাতার বাৎসরিক প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, অভিষেক, ভাণ্ডারা ও দরিদ্র নারায়ণ সেবা এবং শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা। তৎসহ শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, অভিষেক প্রভৃতি অনুষ্ঠান পালিত হইবে।
১৮ই মার্চ	৩রা চৈত্র, বৃহস্পতিবার	পুরী, শ্রীশ্রীবালানন্দ তীর্থাশ্রমে শ্রীশ্রীপরমগুরুমহারাজজীর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উৎসব।
১৯ মার্চ	৪ঠা চৈত্র, শুক্রবার	দেওঘর আশ্রমে শ্রীশ্রীপরমগুরু মহারাজজীর আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে চারদিন ব্যাপী শ্রীশ্রী৺বিষ্ণুলক্ষ্মী যজ্ঞ, বিশেষ পূজা, অভিষেক, অখণ্ড নাম সংকীর্তন, ভাণ্ডারা ও দরিদ্র নারায়ণ সেবা।
২১শে মার্চ	৬ই চৈত্র, রবিবার	সায়ংকালে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ পূজা।
২২শে মার্চ	৭ই চৈত্র সোমবার	শ্রীশ্রীদোলপূর্ণিমা, শ্রীশ্রীবিষ্ণুলক্ষ্মীযজ্ঞের পূর্ণাহুতি। দেবীমন্দিরে পরাৎপর গুরু শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ মহারাজজীর শ্রীবিগ্রহ স্থাপনা উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, অভিষেক।
৪ঠা, এপ্রিল, ৬ই এপ্রিল	২০শে চৈত্র, বরিবার ২২শে চৈত্র, মঙ্গলবার	হৃষিকেশ আশ্রমে সকল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার বার্ষিক তিথি উপলক্ষ্যে ৩ দিবস ব্যাপী শ্রীশ্রীবিষ্ণুলক্ষ্মী যজ্ঞ, ভাণ্ডারা, দরিদ্র নারায়ণ সেবা।
৯ই এপ্রিল	২৪শে চৈত্র	দেওঘর তপোবন আশ্রমে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, অভিষেক, ভাণ্ডারা ও দরিদ্র নারায়ণ সেবা।
১২ই এপ্রিল থেকে ১৬ই এপ্রিল	২৮শে চৈত্র, সোমবার ১৪৩৪ সন ২রা বৈশাখ, শুক্রবার	বাঁকুড়া আশ্রমে শ্রীশ্রীবাসন্তীপূজা উৎসব।
১৩ই এপ্রিল থেকে ১৫ই এপ্রিল	১৪৩৩ সনের ২৯শে চৈত্র, মঙ্গলবার থেকে ১৪৩৪ সনের ১লা বৈশাখ	বারাণসী তীর্থাশ্রমে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণামাতার বার্ষিক প্রতিষ্ঠা তিথি ও শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে ৩ দিবসব্যাপী লঘুরুদ্র যজ্ঞ, বিশেষ পূজা, পাঠ, ও অভিষেক, সাধুভাণ্ডারা ও দরিদ্র নারায়ণ সেবা প্রভৃতি অনুষ্ঠান পালন করা হইবে।
	১৪৩৩ সনের ৩০শে চৈত্র	শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা পূজা।

সম্পাদকীয়

"অয়ি গিরিনন্দিনী"

শিশির সিক্ত শেফালি, বাতাসে হিল্লোলিত কাশফুলের দোলন আর তারই ফাঁকে মেঘ-রৌদ্রের খেলা— এ হেন ইঙ্গিত জানিয়ে দিচ্ছে "আজ শরতে আলোর বাঁশি বাজল"— অর্থাৎ বাঙালীকে উদ্বেলিত করছে "ওঠো, প্রস্তুতি নাও," মা যে আজ আসতে চলেছেন বাপের বাড়ি— "সঙ্গে গণেশ কার্তিক আর লক্ষ্মী সরস্বতী।"

মা'কে নিয়ে বাঙালী মনের উচ্ছ্বাসকে আটকে রাখা যায় না। এ যে 'মহোৎসব'। সারাবছর ধরে বাঙালীরা অপেক্ষা করে থাকে মাতৃ আগমনের জন্য। মাকে ঘিরে গ্রাম বাংলায় শুরু হয়ে যায় আগমনীর গান। চারিদিকে চলে সাজ সাজ রব। সব ধরণের ব্যবসায়ীরা সারা বছরের মুনাফা তুলে নেয়। শুধু কী নতুন জামাকাপড়? ডেকরেটর, ইলেকট্রিসিয়ান, সমস্ত শিল্পী কারিগরেরা যে যার স্তরে স্বচ্ছন্দে থাকার মত নিজেদের গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। শারদীয়াই তো বাঙালীদের সব থেকে বড় উৎসব।

অদ্বৈত বিচারে যদিও 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' আর আমাদের গুরুমহারাজজী সর্বক্ষণই সৎ সঙ্গে আমাদের সেই কথাই মনে করিয়ে দেন এ মায়া প্রপঞ্চময়, তবুও কোথায় যেন তিনি সেই উচ্চ শিখর থেকে আমাদের জন্য নিজেকে নামিয়ে এনে আনন্দময় স্বরূপ হয়ে জীবনের চলার পথের লোকশিক্ষার জন্য সমস্ত কিছুই বিধিসমম্মতভাবে সুচারুরূপে পরিচালনা করে গেছেন।

আজও তাঁর অপ্রকটকালে দেওঘর আশ্রমে নিখুঁতভাবে পালিত হয়ে আসছে বহু ভক্ত সমাগমের সঙ্গে তাঁর দ্বারা প্রচলিত এই দুর্গাপুজো। আসুন আমরা মায়ের ভাবে মাকে ভেবে গুরুকৃপায় মনের সকল ময়লা দূর করতে সেথায় "সবারে করি আহ্বান।"

জয়গুরু